স্মরি সম্ভ্রানে

– ফারহানা আতিক মুনমুন

এই পর্যন্ত জীবনে অনেকের কাছ থেকেই প্রেমপত্র পেয়েছি। অনেকেই জীবনের বাকে বাকে প্রেম নিবেদন করেছে। তারা সবাই আজ দেশে বিদেশে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীতে স্ব স্ব পেশায় সুপ্রতিষ্ঠিত। নাম উল্লেখ করছি না। তবে তারা বর্তমানে :

কেউ আর্মির লেফটেনান্ট
পরে ডোরা কাটা প্যান্ট।
কেউ ডাক্তার
মাথায় পড়েছে টাক তার।
কেউ অস্ট্রেলিয়া–তে চাকরিরত
আজো মোর ধ্যানরত।
কেউ নিটে
থাকে সিলেটে।
কেউ চায়না দেশে ইঞ্জিনিয়ার
নিয়ে বুকে কষ্ট অপার।
কেউ আমেরিকা–য় প্রবাসী
পচা জলে গেছে ভাসি।
আজ তারা গৃহবাসী
বুকে কষ্ট, ঠোটে হাসি।

সকল দর্প চূর্ণ করে আমি যার দাসী
সে একজন মেরিন অফিসার।
দিয়েছে সোনার সংসার,
শুধু তারে ভালোবাসি
শুধু তারই প্রত্যাশী।

আজ ভালোবাসা দিবসে সেই সব প্রেমিকদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

চট্টগ্রাম থেকে

দ্বৈত

মহাকাশে কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে রয়েছে। প্রত্যেকের স্বতন্ত্র অবস্থান রয়েছে। রয়েছে স্বতন্ত্র কক্ষপথ। সচরাচর কেউ নিয়ম ভঙ্গ করে অপরের কক্ষপথে প্রবেশ করে না।

আমার মনের আকাশেও তেমনি দুটি জ্যোতিষ্ক স্বমহিমায় ভাস্কর হয়ে রয়েছে। এদের কারো সঙ্গে কারো সংঘাত নেই।

আমি এক গরিব ঘরের ছেলে। প্রাইমারি স্কুল পাস করার পর দূরের এক নামকরা হাই স্কুলে ভর্তি হলাম। সঙ্গে করে আনলাম দুটো সার্টিফিকেট। **এক.** সৎচরিত্র, **দুই.** মেধাবী ছাত্রের। জায়গির মিললো এক বিরাট বড়লোকের বাড়িতে। আমার আচার-আচরণে জায়গির বাড়ির সকলে সন্তুষ্ট হলো। গ্রামের সকলেও আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

ক্লাস এইট পর্যন্ত নিরুপদ্রবেই কাটলো। বিপত্তি ঘটলো যখন ক্লাস নাইনে উঠলাম। লজিং মাস্টারের উঠতি বয়সের মেয়ে আর ভাতিজি দুজনের বয়সের উতলা মেজাজ আমার ওপর আসর করলো। তারা আমাকে উত্যক্ত করতে লাগলো। অসতর্কতার ভান করে নগ্নভাবে একজন বুকের আপেলযুগল এবং অপরজন আনার দুটোকে দেখানো পর্যন্ত অগ্রসর হলো। আমি নির্বিকার। কারণ আমার গলায় ঝোলানো দুটো সার্টিফিকেট এবং নিজের অবস্থান সম্পর্কে আমি সদা সচেতন।

এদিকে জীবনে প্রথম যেন দখিনা হাওয়া আমার গায়ে লাগলো। কোকিলের স্বর আমার কানে মধু বর্ষণ করলো। দিনমান যায় আলেভালে। নিদ নাইকো রাতি কালে।

এক চৈতি চাদনি রাতে আমি বিছানায় ছটফট করছি। হঠাৎ আপন হাতের স্পর্শ আমার মধ্যে এক অজানা শিহরণ জাগালো। আমি পরম সুখ অনুভব করলাম। এক নতুন জগতের দরজা আমার কাছে খুলে গেল।

যাত্রা হলো শুরু। এক মরণ নেশা আমাকে পেয়ে বসলো। সুযোগ পেলেই মেয়ে দুটো দিনে আমাকে উত্তেজিত করে আর রাতে আমি স্বমেহনের সুখ অনুভব করি। আমি আত্মকেন্দ্রিক হলাম।

একদিন এক হাটুরে কবিরাজের কাছে এ মরণ খেলার ভয়ংকর পরিণতির কথা শুনে আতংকিত হলাম, চিন্তিতও হলাম। তবুও এ নেশা কাটে না।

স্কুল জীবন শেষ হলো। কলেজে গেলাম। সৎ চরিত্রের সনদপত্র বহাল থাকলেও মেধাবী ছাত্রের সনদপত্র বহাল রইলো না। খুড়িয়ে খুড়িয়ে পড়াশোনা চালাতে লাগলাম।

বিএ পাসের আগে এক বিশেষ পরিস্থিতিতে আবিদাকে বিয়ে করতে হলো। বেকার জীবন, তাই বৌ নিয়ে বাড়ি যাওয়া হলো না। কালেভদ্রে শ্বশুরবাড়ি গেলে এক চাটাই ঘেরা ঘরে রাত বাস করতাম। এক পাশের ঘরে শ্বশুর-শাশুড়ি, অন্য পাশের ঘরে অন্য এক ভাড়াটে। রাতে আলো জ্বেলে রাখা যায় না, ফিশ ফাশ করেও কথাবার্তা বলা যায় না। কোনো প্রকার শব্দও করা যায় না। আবিদা কুমারী এবং অজ্ঞ। আর আমি ইচড়েপাকা ও ব্যর্থ। মনে পড়লো হাটুরে কবিরাজের লেকচার। দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে নিরাশ হলাম।

বিস্তর চোখের জল আর বেদনা নিয়ে দুইজনের পূর্ণ সম্মতিতে আমাদের কলহবিহীন দাম্পত্য জীবনের অবসান হলো। অভিভাবকেরা অবাক হলো। আসল রহস্য কেউ জানলো না।

হঠাৎ আমাকে সম্পূর্ণ অবাক করে দিয়ে সেকালের ন্যাশনাল ব্যাংক অফ পাকিস্তানের একজন সিনিয়র ক্লার্ক পদে আমার নিয়োগপত্র এলো। আমি অবাক। কারণ সাক্ষাৎকার ভালো হলেও প্রায় নিশ্চিত ছিলাম যে, স্বাস্থ্যগত কারণে আমার কোনো চাকরি হবে না। যাহোক, আমি বর্তে গেলাম।

ভবিষ্যতের একটা নিশ্চয়তা পেলাম। মনে একটা স্বস্তি ফিরে এলো। ছকবাধা নির্ঝঞ্ঝাট জীবন। সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ব্যাংকে লেনদেন করি, হিসাব মেলাই। মেসে থাকি। কাজের বেটি রান্না করে দিয়ে যায়। আরামে খাই। স্বাস্থ্য ভালো হতে লাগলো। আবিদার কথা খুব মনে পড়ে। বুক চনচন করে ওঠে।

হঠাৎ করে একদিন নুরুল ইসলামের *যৌবনের ঢেউ* এবং আবুল হাসনাতের *যৌন বিজ্ঞান* বই দুটোর সন্ধান পেলাম। বই দুটি মন দিয়ে পড়লাম। অমূলক ভয় কিছুটা দূর হলো। এক রাতে ওপাড়ায় গিয়ে পরীক্ষা দিলাম। উৎরে গেলাম। আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলাম।

ততোদিনে আবিদার অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেছে। হুসনাবানুকে বিয়ে করলাম। নতুন জীবন পেলাম। সন্তানসন্ততিরা আজ দেশে বিদেশে প্রতিষ্ঠিত। দাম্পত্য জীবনে আমরা খুব সুখী।

ঘর ভাঙা মেয়ের আমাদের সমাজে ভালো বিয়ে হয় না। ছেলেদের হাজার খুন মাফ। আবিদার সঙ্গে কয়েকবার দেখা হয়েছিল, কথা হয়নি। তার চোখেমুখে বেদনার ছাপ দেখেছি।

অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করতে গেলেই আবিদার বেদনামলিন মুখচ্ছবি আমার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। তাকে আমি দুঃখ বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারিনি।

আজও আমি দূর থেকে তাকেই ভালোবাসি।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রাকৃতিক

– টিএমএবি সিদ্দিক

ভালোবাসা শুধু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পশু পাখির মধ্যেও ভালোবাসার আকুতি দেখা যায়। প্রিয় পাঠকদের এ রকম একটি ভালোবাসার ঘটনা বর্ণনা করেই আমার এ লেখার ইতি টানবো।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে আমার বাসার সম্মুখে ম্যানহোলের ভেতরে একটি কুকুর চারটি বাচ্চা দেয়। কয়েকদিন পর বাচ্চাগুলোর চোখ ফোটার আগেই যে কোনোভাবে হোক ম্যানহোলে সামান্য পানি জমে। বাচ্চাগুলো পানিতে নিমজ্জিত হলে মা কুকুরটি হয়তো কামড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েই দিশাহারা হয়ে পড়ে। তখন সে বিশেষ ভঙ্গিমায় চেচামেচি করতে করতে একবার আমার বাসার সামনে অবস্থানরত আমার স্ত্রীর কাছে আবার ম্যানহোলের কাছে দৌড়াতে থাকে। আমার স্ত্রী ব্যাপারটি বুঝতে না পেরে কুকুরের সঙ্গে সঙ্গে ম্যানহোলের কাছে যায় এবং দেখে বাচ্চা চারটি পানিতে নিমজ্জিত। সঙ্গে সঙ্গে একজন সুইপারকে ডেকে বাচ্চাগুলোকে ম্যানহোল থেকে উদ্ধার করে।

এ ভালোবাসা একটি পশু মায়ের শিশু বাচানোর জন্য হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা। এ ভালোবাসার কোনো তুলনা হয় না। আমরা ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবসকে সামনে রেখে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই আমরা আর চাই না কোনো ধর্ষণ, চাই না এসিড নিক্ষেপ, চাই না রক্তপাত, ভালোবাসার নামে চাই না আর কোনো লোমহর্ষক ঘটনা। আমরা চাই সেই ভালোবাসা যেখানে আছে শুধুই শান্তি আর শান্তি।

হাকিমপুর, দিনাজপুর থেকে

অন্তুলা

– জাহাঙ্গীর আলী

নিদ্রাদেবীর আদুরে পরশ থেকে মুক্তি পেয়ে ধড়ফড় করে উঠে দেখি অনেকক্ষণ আগেই নয়টার কাটা ঝুলে পড়েছে। প্রাথমিক কাজ সেরে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে দেখি ডাইনিং হল ফাকা ময়দান।

বয়টি হাসি মুখে সালাম জানিয়ে বললো, অনেক আগেই দলের সবাই নাশতা সেরে চলে গেছে।

নাকেমুখে ঢুকিয়ে উপরে এসে দেখি সব রুমেরই দরজা তালাবদ্ধ। কারো সাড়া শব্দ নেই। ওদের বে-আক্কেল কাণ্ডে মেজাজ খিচিয়ে উঠলো। এতোই সব স্বার্থপর, যাবার সময় একটু বলে যাবার ভদ্রতা জ্ঞানটুকুও হারিয়ে ফেলেছে। এদের সঙ্গে আসাটাই ভুল হয়েছে। এই বিদেশ-বিভূইয়ে রাতে কোনো অঘটনও তো ঘটতে পারতো। একটু মনুষ্যত্ব বোধও নেই দেখছি।

নিজের মনেই বকবক করে মনটাকে কিছুটা হালকা করার চেষ্টা করে চলেছি। এরই মধ্যে হঠাৎ দরজার পাশে মেঝেতে এক টুকরো শাদা কাগজ পড়ে আছে দেখতে পাই। ওটা হাতে নিয়ে দেখি লেখা রয়েছে *আলম সাহেব ঘুম ভাঙাতে না পেরে কুতুবমিনারের দিকে রওনা হয়ে গেলাম রাতের আলোচনা মতো।* না, তাহলে ওদের তেমন দোষ নেই। দায়ী আমিই। অনর্থক এতোক্ষণ ধরে ওদের গুষ্ঠি উদ্ধার করলাম শুধু শুধু।

সময় আর নষ্ট না করে হোটেলের বাইরে অপেক্ষমাণ এক বেবিট্যাকসিতে চেপে কুতুবমিনার এলাকায় দ্রুত চালানোর হুকুম দিলাম।

ড্রাইভার সাহেব আমার অনভ্যস্ত ভাঙাচোরা হিন্দি বাত শুনে হেসে জানালো, কষ্ট করে হিন্দি কথা বলতে হবে না স্যার, আপনি বাংলায় বললেও আমি বুঝবো।

কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে বললাম, তুমি বাঙালি! কিন্তু তোমার বেশ-ভূষা, চাল-চলনে তো বোঝার উপায়ই নেই।

কি করবো স্যার। খোট্টার দেশে থাকি। ওদের মতোই চলতে হয়। এছাড়া তো উপায়ও নেই।

কুতুবমিনার নতুন দিল্লি এলাকায় অবস্থিত বলে পুরনো দিল্লির সীমানা ছাড়িয়ে নতুন দিল্লির চোখ ধাধানো চাকচিক্যময় এলাকায় প্রবেশ করে মনে হলো এতোক্ষণ যেখান থেকে এলাম সেটা নেহায়েত পাড়াগা ছাড়া আর কিছুই নয়।

চলার ফাকে ফাকে ড্রাইভার জাকারিয়া নিজের কথাও বয়ান করে চলেছে। প্রায় দশ বছর হলো এখানে মানে দিল্লি শহরে এসেছে। অনেক কষ্টে, চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এখন কিছুটা ভালো অবস্থায়। বিয়েও করেছে এখানকার অবাঙালি পরিবারে। আগে নদীর পাড়ে বস্তি এলাকায় থাকতো। এখন পুরনো দিল্লিতে ছোটখাটো একটা বাসা ভাড়া নিয়ে এক ছেলে, এক মেয়ে ও পরিবারসহ আছে। বস্তি এলাকায় সব সময় আতংকে কাটাতো হতো। কখন যে পুলিশের লোক পাকড়াও করে একেবারে বাংলাদেশে পুশ ইন করে দেবে তার ঠিক নেই। এখন আর সে ভয়টি নেই।

কেন, তোমরা কি বাংলাদেশ থেকে এসেছো? জানতে চাইলাম।

জি না স্যার, আমার চোদ্দ পুরুষ মুর্শিদাবাদের। খাটি ভারতীয়। কিন্তু হলে কি হবে, অপরাধ যে অনেক। প্রথমত. বাঙালি, তারপরে আবার মুসলমান। অপরাধ কি আর একটা? ক্ষোভের সঙ্গে কথাগুলো বললো জাকারিয়া।

তাই এখন বাংলা কথা বলাও ছেড়ে দিয়েছি। পরিচয় দিতেও মন চায় না। সব সময় নিজেকে লুকিয়ে রেখে চলি। কিন্তু কেন জানি না আপনার কাছে হঠাৎ মুখ ফসকে বাংলা বলে ফেললাম। রক্তটা যে বাঙালির। স্বভাবটা যাবে কোথায়!

জাকারিয়ার ব্যথা ভরা কথাগুলো শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। খাটি ভারতীয় হয়েও জাকারিয়ার মতো মুসলমানরা ভারতে আজ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে।

রাষ্ট্রপতি ভবন পেরিয়ে আসার পর বিরাট এক ফাকা জায়গার মাঝখানে বিশাল এক ভবন দেখিয়ে বললো, এটাই ভারতের পার্লামেন্ট ভবন। এখান থেকেই সারা ভারতের মানুষের জন্য আইন পাস হয়।

জাকারিয়া যে কিছুটা পড়ালেখা জানে তার কথাবার্তায় সেটা প্রকাশ পায়। বিশাল এই ভবনের স্থাপত্য শৈলী দেখে মনে হচ্ছিল, এটা কোনো পাশ্চত্য দেশের এলাকা। তাই একটু ভালোভাবে দেখার জন্য গাড়ি থামানোর ইঙ্গিত দিতেই ও জানালো, এ এলাকায় যানবাহন থামানো নিষেধ। নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজনের শ্যেন দৃষ্টি চতুর দিকে। একটু থামলেই ওদের খপ্পরে পড়ে নাজেহাল হতে হবে। আপনিও হয়তো রেহাই পাবেন না।

কিন্তু রাস্তা থেকে ভবনের দূরত্ব তো অনেক।

তাতে কি! নিরাপত্তা বলে কথা।

সাধ ছিল ঐতিহ্যবাহী ভবনটিকে একটু কাছ থেকে দেখবো, স্পর্শ করবো, ফটো উঠাবো। কিন্তু বেরসিক নিরাপত্তা বাহিনীর দাপটে তা আর পূরণ করা হলো না।

কিছুক্ষণ আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। মেঘলা দেবীর মুখটা তখনো ভারী। হুমায়ুন টুম্ব-টাও দূর থেকে দেখে নিয়ে কুতুবমিনারের দিকে চলা শুরু করলাম। মোঘলদের সব কীর্তি, নিদর্শনই পুরনো দিল্লি এলাকায়, একমাত্র হুমায়ুন টুম্ব ছাড়া। নতুন দিল্লির সীমানার মধ্যে কুতুবমিনার। জাকারিয়াকে বিদায় দিয়ে কাউন্টারে টিকেট কেটে কুতুবমিনার চত্বরে ঢুকে চারদিকে চোখ মেলেও দলবলের কারো চিহ্নই চোখে পড়লো না। খুব একটা ভিড়ভাট্টাও নেই। কেমন যেন ফাকা ফাকা। বৃষ্টির জন্যও হয়তো বা।

একা একাই বোকার মতো এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি আর হাটছি। হঠাৎ দেখি হালকা কালো চশমা চোখে ছিমছাম সুন্দরী এক মহিলা হাসি মুখে আমার দিকে এগিয়ে আসছে পরনের হালকা নকশা করা অফহোয়াইট শাড়ির ছন্দময় হিন্দোল তুলে। একেবারে কাছে এসে মিষ্টি হাসিমাখা কণ্ঠে শুদ্ধ বাংলা ভাষায় বললো, কি ব্যাপার? একা একা যে, আর সব কোথায়?

সুধাময়ীর মায়াবী কণ্ঠে অবাক হয়ে ধাধায় পড়ে চিন্তা করছি। এ মুখটা তো কখনো দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না। কোনো চিট-টিট-এর পাল্লায় পড়লাম না তো!

সাত পাচ চিন্তা মাথার মধ্যে, কৌতূহলের সীমানা না পার হতেই মহিলা নিজেই আবারও বললেন, গত পরশু রাজধানী এক্সপ্রেসে কলকাতা থেকে এলেন না? আপনাদের পাশের হোটেলেই আছি।

তাই নাকি? এতোক্ষণে কিছুটা হালকা হয়ে বললাম। আর বলবেন না ঘুমের জন্য সব ওলট-পালট হয়ে গেছে। আজকে এখানেই প্রোগ্রাম, কিন্তু কাউকেই তো দেখছি না। যা খারাপ লাগছিল এতোক্ষণ। এখন আর কোনো চিন্তা নেই। বিদেশ-বিভূইয়ে বাঙালি তার ওপর মহিলা, সৌভাগ্য আর কাকে বলে!

অল্পক্ষণের মধ্যে অন্তুলা আর আমার মধ্যকার দূরত্ব দূর হয়ে মনে হলো, কতোদিনের যেন পরিচিত আপনজন। অন্তুলার অপর দুই সঙ্গী নতুন দিল্লির কাজ সেরেই এখানে চলে আসবে বলে জানালো। শান্ত, সৌম্য, মায়াবী আকর্ষণীয় চেহারার অন্তুলা এসেছে পশ্চিমবঙ্গের *শান্তিনিকেতন* থেকে।

এতোক্ষণে আলোর ঝিলিক দেখা গেল। সোনালি রোদের পরশে সারা চত্বর মোহনীয় হয়ে উঠলো। অন্তুলার অনুরোধে পূব দিকের ধ্বংস স্তূপের ছড়ানো-ছিটানো বড় দুটি পাথর খণ্ডের ওপর বসলে অন্তুলা জানালো এর আগেও সে এখানে এসেছে। এই স্থানটার ওপর তার ভীষণ টান। সুযোগ পেলেই এখানে ছুটে আসে প্রতি বছর এ সময়। একেবারে গা ঘেষে না বসলেও অন্তুলার শরীর থেকে এক মিষ্টি গন্ধে স্থানটা একেবারে মৌ মৌ করছে। মনে হচ্ছে, একরাশ তাজা ফুলের গন্ধ। কুতুবমিনারের ইতিহাস আদ্যপান্ত গড় গড় করে বলে চলেছে। বলার অদ্ভুত ভঙ্গিমায় মুগ্ধ শ্রোতা হয়ে স্বাদ নিয়ে চলেছি।

স্বল্প পরিচিতার সুশ্রী মুখের দিকে চেয়ে এক সময় জানতে চাইলাম, সে কি ইতিহাসের ছাত্রী?

হেসে মাথা দুলিয়ে জানালো, না, সে ভাষাতত্ত্বের।

তাহলে ইতিহাসের এতো সব খুটিনাটি জানলে কিভাবে একেবারে পাকা ইতিহাসবিদদের মতো?

পড়াশোনা করে সব জেনেছি। শান্ত মুখে জানালো অন্তুলা।

ইদানীং কুতুবমিনার কর্তৃপক্ষ চূড়ায় ওঠা বন্ধ করে দিয়েছে। কিছু দুর্ঘটনার কারণে। কিন্তু অন্তুলা নাছোড়বান্দা। সে রীতিমতো জেদাজেদি শুরু করেছে চূড়ায় সে উঠবেই। এরই মধ্যে আরো কিছু দর্শক জুটে গেছে, তারাও সাপোর্ট করা শুরু করেছে। কেমন যেন একটা অশান্ত ভাব। আমারও ভীষণ ইচ্ছে করছিল উচু মিনার চূড়া থেকে সারা দিল্লি শহরটা দেখার। তবে কর্তৃপক্ষ কুতুবমিনারের মতোই অনড় হয়ে রইলো।

অগত্যা ভগ্ন হৃদয়ে সেখান থেকে ফিরে আসার জন্য অন্তুলার খোজ নিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি সে নেই। দ্রুত সেখান থেকে বের হয়ে ফাকা চত্বরে এসে খোজাখুজি করেও অভিমানীর দেখা মিললো না। তাহলে কি তার ফিরে আসা সঙ্গীদের সঙ্গে চলে গেছে! তবুও তো ভদ্রতার খাতিরে বলে যাওয়া

উচিত ছিল। আমার অভিমানটাও তার ওপর গিয়ে পড়লো। পরিচিতা মহিলাটি হঠাৎই বাতাসের মতো উধাও হয়ে যাওয়ার জন্য মনের মধ্যে কেমন যেন ধাধার সৃষ্টি হয়ে রইলো। খুজে না পেয়ে শেষে মনের মধ্যে একগাদা প্রশ্ন নিয়েই ফিরে এসে পাশের হোটেলে খোজ নিয়ে জানলাম ওই নামের কোনো মেয়ে তাদের বোর্ডার নেই। তাহলে কি অন্য কোনো হোটেল?

ঘুরেফিরে সারাক্ষণই অন্তুলার কথা মনের মধ্যে উকি দিচ্ছে। কোনো কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না। দলের লোকজনের ধারণা, তাদের সকলের ব্যবহারেই বুঝি আমার এই নীরবতা। আমাদের দিল্লির প্রোগ্রামও শেষ। এবার ফিরে যাবার পালা। নানান চিন্তার মধ্যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ দরজায় টকটক শব্দে মাথা উঠিয়ে দেখি খোলা দরজা ধরে দাড়িয়ে রয়েছে রহস্যময়ী অন্তুলা।

কি আশ্চর্য ব্যাপার! আপনি বহাল তবিয়তে! আর আমি কি না সেই থেকে দুশ্চিন্তায় মরছি। বড় সাংঘাতিক মানুষ বটে। আপনার সঙ্গে কথা না বলাই উচিত। অভিমানী কণ্ঠে বললাম।

সত্যি আমি ভীষণ লজ্জিত। হঠাৎ না বলে চলে আসার অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। আপনার মনোকষ্টের জন্য আমিই দায়ী। ব্যথিত কণ্ঠে কথাগুলো বলে মাথা হেট করে রইলো অন্তুলা।

আরে, না না। আপনি যে সুস্থ শরীরে আছেন এ জন্য কি যে আনন্দ লাগছে তা আর কেমন করে বোঝাবো।

আপনার জন্য কিছু... কথা শেষ করতে না দিয়েই বাধা দিয়ে বললো, না, এতো রাতে আর কোনো কিছু নয়। সকালে চলে যাবেন। তাই রাতেই কষ্ট দিতে এলাম বলে দুঃখিত। আপনি ভালো থাকুন, দুশ্চিন্তামুক্ত থাকুন। কথাগুলো বলে হাত নেড়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে গেল অন্তুলা।

দরজায় দড়াম শব্দে লাফিয়ে উঠে দেখি অনেকক্ষণ আগেই সকাল হয়ে গেছে। এতোক্ষণ তাহলে কি স্বপ্নে অন্তুলার সঙ্গে কথা বলছিলাম? মনটা আবারও চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল।

আগ্রা হয়ে কলকাতা ফিরতে আরো কয়েকদিন কেটে গেল। বাংলাদেশে ফেরার আগের দিন কাউকে কিছু না জানিয়ে অন্তুলার খোজে একেবারে শান্তিনিকেতনে গিয়ে হাজির হলাম। ভাষাতত্ত্ব বিভাগে ঢোকার সদর দরজার পাশে বিরাট আকারের অন্তুলার মতো ছবি দেখে কাছে গিয়ে ছবির নিচের লেখাগুলো পড়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম।

কতোক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না। অনেকগুলো কাকলি কণ্ঠের শব্দে সংবিৎ ফিরে পেয়ে, কাউকে আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা না করে, আরো একরাশ বিস্ময় মনের মধ্যে পুরে নিয়ে শান্তিনিকেতন চত্বর থেকে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে এলাম।

রাজশাহী থেকে

বিশ্বাস

- M.I.S,

২২ সেপ্টেম্বর ২০০০। আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন।

এই দিনে তুমি আমার জীবনে ভালোবাসার বার্তা নিয়ে এসেছিলে। জানি না কোন কারণে তুমি কাপুরুষের মতো আমার কাছ থেকে পালিয়ে গেলে। তুমি একটা স্বার্থপর, প্রতারক, তুমি সমগ্র পুরুষ

জাতির, বিশেষ করে আর্মির কলংক। তুমি কখনো নিজেকে আদর্শবান পুরুষ ভেবো না। এতে তোমার প্রেমিকারা হাসবে যাদের তুমি মিথ্যা ভালোবাসার স্বপ্ন দেখিয়েছিলে।

আমি জানি তুমি আমাকে ভুল বুঝেছো। বিনা কারণে আমাকে ভুল বোঝার কোনো অধিকার তোমার নেই। তুমি খুব ভালো করে জানো আমি কেমন মেয়ে। আমি জীবনসঙ্গী হিসেবে তোমার যোগ্য সেটা তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করো। আমাকে তুমি মানসিকভাবে এতো যন্ত্রণা দিয়েছো, এতো কাদিয়েছো যা কখনো ভোলা যায় না। কষ্টে আমার বুক ফেটে যেতো, দুচোখ দিয়ে বৃষ্টির মতো পানি ঝরতো। আর তুমি দাড়িয়ে থেকে হাসতে। কারণ তোমার হৃদয় বলতে কিছু ছিল না।

তোমার ভেতরে ছিল কিছু কামনা বাসনা, ছিল কিছু চাহিদা যা পূরণ করার জন্য তুমি আমার জীবনে এসেছিলে। কিন্তু যখন পারলে না তখন আমার পাশ কাটিয়ে পাড়ি জমালে দূর দেশে।

নাহ! একেবারে যাওনি। মাত্র দুই বছর পরে দেশে ফিরে আসবে। তারপর বাবা মায়ের পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে করে আদর্শবান স্বামী হয়ে যাবে। এটা তোমাদের আর্মির ধর্ম।

তোমাকে নিঃস্বার্থভাবে শুধু ভালোবেসেই গেছি বিনিময়ে ফেলেছি চোখের জল।

এতো কিছুর পরেও তোমাকে ভালোবাসি খুব। আজকের এই পবিত্র ১৪ ফেব্রুয়ারিতে তোমার প্রতি রইলো আমার বিশেষ দোয়া এবং হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা। তুমি যেখানেই থাকো ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সুখে থেকো, নিরাপদে থেকো। তোমার অক্লান্ত পরিশ্রম তোমায় সফলতার শীর্ষ বিন্দুতে পৌছে দিক এই প্রার্থনা করি মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে। তোমার প্রতি আমার একনিষ্ঠ প্রেম যদি পবিত্র হয়ে থাকে তবে আমার বিশ্বাস, যেখানেই থাকো ইনশাআল্লাহ তুমি আমার কাছে ফিরে আসবে। জেনে রাখো, একমাত্র আমিই তোমাকে প্রকৃত ভালোবাসায় পরিপূর্ণ করে তুলবো যা অন্য কেউ পারবে না।

সবশেষে তোমাকে দুটো উপদেশ দিচ্ছি মেনে চলো। **এক.** সব সময় নিজেকে ভালো রাখার চেষ্টা করো, **দুই.** জীবনে এমন কোনো ভুল করো না যেন তোমার কষ্ট পেতে না হয়। পারো তো সুখে থাকার চেষ্টা করো।

আজো তোমার অপেক্ষায় আছি।

A.S.A
রংপুর থেকে

অপারেশন ক্লিন হার্ট

– শিকদার আবদুল গনি

আমি কোনো অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী নই, কোনো চিহ্নিত ক্যাডারও নই। তবুও ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে এক সেনাসদস্যের অভিযানের কবলে পড়েছিলাম। তবে কোনো জেল-জুলুম সইতে হয়নি।

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। আমাদের পাড়া প্রতিবেশী সাবেক সেনাসদস্যের আদরের কন্যার প্রেমে পড়েছিলাম। আমি সবেমাত্র ইন্টারমিডিয়েটে পড়ি আর সে অর্থাৎ খুশি লেখাপড়ায় খুব একটা ভালো ছিল না। ফেল করে করে ক্লাস নাইনে উঠেছে।

ভালোই কাটছিল দিনগুলো। রাস্তাঘাটে দেখা হলে হাজারো চোখ ফাকি দিয়ে ছোট ছোট করে দুই চারটি প্রেমের কথা বলতাম আর চিঠি দেয়া–নেয়ায়ও তার বান্ধবী ঝর্না আমাদের বেশ সাহায্য করতো। বেশ ভালোই প্রেম জমে উঠেছিল। কিন্তু হঠাৎ করে একদিন খুশি আমাকে উপেক্ষা করতে লাগলো। দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আমাকে দেখলে দৌড়ে বাড়ির ভেতরে পালায়। কি অপরাধ করেছি তাও বলে না।

সেদিন মাথায় ভীষণ জেদ চেপে গেল। কি করবো বুঝে উঠতে পারছি না। তাই দাড়িয়ে রইলাম সে যে পথ দিয়ে প্রাইভেট পড়ে আসবে ঠিক সেই পথে। দেখি সে দ্রুত পায়ে হেটে আসছে। আশপাশে তাকিয়ে দেখি কেউ নেই। তার পথ আটকে দাড়ালাম। কি ব্যাপার, তুই আমার সঙ্গে এমন করছিস কেন?

রাগের মাত্রাটা এতো বেশি ছিল যে, তুমি থেকে তুইতে গিয়ে পৌছেছিল।

আমার রাগান্বিত চেহারা দেখে খুশি ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ভয়ে সে দুই হাত তুলে ক্ষমার ভঙ্গিতে আমাকে বলছিল, প্লিজ, আমাকে মাফ করে দাও। পরে তোমাকে সব বলবো।

কিন্তু আমার রাগ, অভিমান তার ক্ষমাপ্রার্থী দুই হাতকে ক্ষমা করেনি। কোনো কিছু বোঝার আগেই তার বাম গালে ভীষণ জোরে একটা চড় বসিয়ে দিই।

যা কুত্তা, আমার চোখের সামনে থেকে সরে যা। কোনোদিনও আমার সামনে এসে দাড়াবি না, যা ভাগ। বলতে বলতে দেখি তার চোখ থেকে ঝর ঝর করে বৃষ্টিধারার মতো পানি ঝরছে। আমি আর দাড়িয়ে থাকিনি। সোজা চলে গেলাম ও যেদিকে যাবে তার উল্টো দিকে।

সারাদিন ভালোই কাটলো যেন উৎকৃষ্ট প্রতিশোধ নিতে পেরেছি। কিন্তু সেদিন রাতে একদম ঘুমাতে পারিনি। বার বার তার অসহায় মুখখানা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। জানি পুরুষ মানুষ সহজে কাদে না। কিন্তু সেদিন রাতে আমি প্রচণ্ড কেদেছিলাম। মাথার নিচের বালিশটার অনেকখানি ভিজে গিয়েছিল। সারা রাত ভেবেছি এ আমি কি করলাম? কেন তার গায়ে হাত তুললাম? কেন তাকে ক্ষমা করতে পারলাম না?

তারপর তাকে আমার সামনে তেমন একটা আসতে দেখিনি। হঠাৎ একদিন পাশের বাড়ির ঘরে একা পেয়ে হাত ধরে বললাম, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। সেদিন রাগের মাথায় কি থেকে কি হয়ে গেল আসলে বুঝতে পারিনি। আমাকে ক্ষমা করে দিও।

বলতেই সে আমার মুখ চেপে ধরে বললো, কে বলেছে আমি তোমার ওপর রাগ করেছি। তুমি আমাকে মেরেছো, আমি একটুও কষ্ট পাইনি।

খুশির মুখে এ কথাগুলো শুনে খুশিতে দেড়খানা হয়ে গিয়েছিলাম। খুশিতে সেদিন হাজারো চুমোয় ভরিয়ে দিয়েছিলাম তার সুন্দর মুখখানা। সে কিছুই বলেনি। লজ্জায় চোখ দুটো বন্ধ করে রেখেছিল। আর আমার তৃষ্ণার্ত ঠোট দুটো তার ঠোট, নাক, কপালে অবিরাম চষে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ বাড়ির

মালিক সম্পর্কে চাচি প্রবেশ করায় বাধা পড়লো প্রেমাদরে। তারপর চাচির সঙ্গে এ কথা, সে কথা বলে কেটে পড়লাম।

কয়েকদিন পর তার বান্ধবী ঝর্নাদের বাড়িতে টিভি দেখতে গিয়েছি। রাত তখন নয়টার উপরে। ঝর্না একটি চিঠি ধরিয়ে দিয়ে বললো, খুশি দিয়েছে। ত্বরিত গতিতে ঝর্নাদের বারান্দায় জ্বালানো লাইটের নিচে গিয়ে চিঠিটা খুলে পড়লাম।

আজ রাত আটটায় আমাদের বাড়ির সামনে আম গাছের নিচে এসো, কথা আছে।

কিন্তু এখন তো বাজে প্রায় দশটা। ঘরে গিয়ে ঝর্নাকে ডেকে বললাম, চিঠি কখন দিয়েছে?

বললো, দুপুর বেলা।

বললাম, তাহলে দিন থাকতে দিলে না কেন?

ঝর্না বললো, আসলে সময় পাইনি।

আগামীকাল আটটায় থাকতে বলো।

ঝর্না কিছু বুঝতে না পেরে বললো, কোথায় থাকতে বলবো?

বললাম, তুমি শুধু বলো আটটায় থাকতে, বাকিটা সে বুঝবে।

পরদিন ঠিক সময়ে জায়গা মতো পৌছালাম। দেখি খুশি আমার অপেক্ষায় দাড়িয়ে আছে। কথা বলতে গিয়ে প্রচণ্ড আবেগের কাছে হার মানলাম। জড়িয়ে ধরে দাড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ।

খুশি বললো, তুমি আমাকে কি জাদু করেছো। আমার কিছুই ভালো লাগে না।

আমি অত্যন্ত আবেগের স্বরে বললাম, প্রতিদিন এখানে এসো, দেখবে ভালো লাগবে। এভাবে মাঝে মধ্যে আমাদের দেখা ও কথা হতো।

এক সময় আমার ভেতরে প্রচণ্ড এক আকাঙ্ক্ষা দানা বাধলো। তাকে আরো গভীর করে পেতে চাইলাম। মুখে বলতে ভয় হচ্ছিল। তাই চিঠিতে জানিয়ে দিলাম আমি আজ তোমাকে আরো গভীর করে পেতে চাই যদি তোমার আপত্তি না থাকে। আমি জানি, মেয়েরা এই একটির ব্যাপারে ভীষণ সতর্ক। তবুও চেষ্টার ত্রুটি করলাম না। তসলিমার লেখা সেই বাণীটা ব্যবহার করতে ভুল করিনি। পাপ শরীরে নয়, থাকে মনে। তাই যদি সম্ভব হয় তাহলে তেমনি প্রস্তুতি নিয়ে এসো, না হলে এসো না।

ঠিক সময়ে আমি দুরু দুরু বুকে নির্দিষ্ট স্থানে পৌছালাম। দেখি সে দাড়িয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, চিঠিটা পড়েছো?

বললো, হ্যা।

বুঝেছো যা লিখেছি।

বললো, না।

তাহলে এসো বুঝিয়ে দিই বলেই তাকে পাগলের মতো জড়িয়ে ধরলাম।

সে বাধা দিতে চাইলো। বললো, আজ না, পরে হবে।

আমি মানতে রাজি নই। আমি তার শরীরের বিভিন্ন অংশে অভিযান শুরু করলাম। এদিকে আমার লুঙ্গির নিচের ভয়ংকর জন্তুটা ক্ষিপ্ত হয়ে লুঙ্গি ছিড়ে, ফুড়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে। তার সালোয়ারের

ফিতায় টান দিতেই লাগলো যতো গণ্ডগোল। উত্তেজনার চরমে, অথচ গিট্টু লাগলো ফিতায়। এখন কি করি? চেষ্টা করতে লাগলাম গিট্টু ছাড়াতে। কিন্তু পারছি না।

হঠাৎ আমার পিঠে সজোরে এক আঘাত অনুভব করলাম। কে যেন আমাকে এক টানে দূরে মাটিতে ফেলে দিল। চাদের আবছা আলোয় ফিরে তাকিয়ে দেখি তার সেনা বাবা পেছনে দাড়িয়ে। কোনো রকম দৌড়ে পালিয়ে প্রাণে বাচলাম।

কষ্ট হচ্ছিল খুশির জন্য না জানি কি হয়। আমি জানি না সেদিন খুশির ওপর অত্যাচারের মাত্রাটা কতোটুকু ছিল। সারা রাত ভাবলাম কিভাবে তার সেনা বাবা বিষয়টা টের পেল। এ যেন শিয়ালের মুখের গ্রাস বাঘের ছিনিয়ে নেয়া।

তারপর থেকে খুশির ওপর চললো কড়া নিরাপত্তা। তাকে গৃহবন্দী করা হলো। আমি শিকার হারানো শিয়াল যেন বিড়াল হয়ে গেলাম, বাঘ হতে পারলাম না। এসব নিয়ে বাড়াবাড়ি করার সাহস হলো না।

অল্প দিনের মধ্যেই খুশির জন্য পাশের গ্রামের চাকরিজীবী সুদর্শন এক পাত্র ঠিক করলেন। অবশেষে প্রচণ্ড এক ঝড়ের দিনে খুশি চলে গেল তার শ্বশুরবাড়ি।

বর্তমান সরকারের এক দৃঢ় পদক্ষেপ সেনা অভিযান, জনমনে ব্যাপক সাড়া ফেলে। দেশ থেকে সন্ত্রাস কমে যাচ্ছে। আর সেই সঙ্গে *অপারেশন ক্লিন হার্ট* নামে যে অপারেশন পরিচালিত হয় তাতে সন্ত্রাসীদের হৃদয় কতোটুকু পরিষ্কার হচ্ছে সে বিষয়ে সঠিক কোনো ধারণা আমার নেই। কিন্তু তার বাবার অর্থাৎ ওই সেনাসদস্যের অভিযানে কোনো রকম বাচলেও তার বাবার অপারেশন ক্লিন হার্ট-এ আমার হৃদয় এতোটুকু ক্লিন হয়নি।

আমি পারিনি আমার হৃদয় থেকে খুশি নামটা মুছে ফেলতে।

ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে

নষ্ট পুরুষ

– এ.আর.এস রেজা

সীমাহীন ধৈর্য আর সংযমের মধ্য দিয়ে তিন বছরের প্রবাস জীবন শেষ করলাম। সেই সঙ্গে সাতাশ বছরে পা রাখলাম গত ২০০২-এর মার্চে। এ মাসে বাড়ি যাবো। মনে কতো যে আনন্দ।

বেশি আনন্দে মানুষের চোখে পানি এসে যায় তার প্রমাণ পেলাম যখন টিকেট এবং পাসপোর্ট হাতে পেলাম। ধীরে ধীরে স্বপ্নগুলো বাস্তব হবে। স্বজনদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। এতোদিন পর আবার জন্মভূমিতে ফিরে যাবো। যেখানকার মাটি ও মানুষের সঙ্গে আমার নাড়ির সম্পর্ক। ফিরে যাবো আমার মায়ের আচলের নিচে। বাবা নেই। বাবা থাকলে এতো বড় ব্যবসাটা মানুষে লুটেপুটে খেতে পারতো না। একজন বড় ভাই থাকলেও হয়। তাও নেই। মানুষ যেন এ রকম সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিল। দেনাদার-পাওনাদার সবাই মিলে পাওনাদার হয়ে গেল। লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিল। দুই বছরের মাথায় অর্থ-কড়ি প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এলো। যা কিছু অবশিষ্ট ছিল মায়ের বুদ্ধিতে

দালালের হাতে তুলে দিলাম। দালালের অতিরিক্ত আবদারের কারণে মায়ের সুন্দর নেকলেসটি বিক্রি করে দিলাম।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল বলে ভালো চাকরি পেয়েছিলাম। তবে এখনো আগের সেই অবস্থা ফিরে পাইনি। কিন্তু কাছাকাছি এসে দাড়িয়েছি। দশ লাখ টাকা পাঠিয়েছি মায়ের নামে। মায়ের জন্য নেকলেস কিনেছি।

এক চিঠিতে মা লিখেছিলেন, এক সেট গহনা যেন নিয়ে আসি।

সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম মায়ের কি ইচ্ছা। হবু পুত্রবধূর জন্যই এ অর্ডার। সব রকম বাজার সেরে ফেলেছি। মাত্র দুই দিন পর ফ্লাইট। মনে খুশির বন্যা বইতে শুরু করেছে। সময় আর কিছুতেই কাটতে চাইছে না। বিয়ে করবো এ কথা ভাবতেই মনে অজানা সুখ দোলা দেয়। গহনাগুলো হাতে নিয়ে দেখি, কল্পনা করতে পারি না। পরিচিত কোনো মুখ ভেসে ওঠে না। তবুও কতোদিন ভাবতে থাকি।

অবশেষে প্রতীক্ষার দিন শেষ করে মে মাসের ৩ তারিখ মায়ের কাছে পৌছে যাই। সেদিনটি সত্যিই খুব আনন্দের ছিল। আমার শুভ কাজ যেন তাড়াতাড়ি হয়ে যায় সে জন্য আগেই ফোনে বলেছিলাম আমার ছুটি মাত্র তিন মাসের। দিন যায় আর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। এক সপ্তাহ চলে যায়, কারো কাছ থেকে বিয়ের ব্যাপারে কোনো সাড়া-শব্দ পাই না। মনে করি গোপনে হয়তো মেয়ের খোজ চলছে।

আঠারো দিন চলে গেল, কোনো খবর নেই। কিছুটা হতাশ, কিছুটা আশা নিয়ে অপেক্ষা করছি। এক মাস পার করে ফেললাম। কোনো আভাস পর্যন্ত পাওয়া গেল না। বুঝতে পারলাম, বিয়ে করা হবে না। আমার সব আশা-ভরসা, যতো কল্পনা, স্বপ্ন সব ভেঙে চুরমার হতে থাকলো। মায়ের এ রকম আচরণের কারণ তখন খুজে পাইনি।

এরপর বন্ধুদের সঙ্গে নিয়মিত আড্ডা দিতে থাকলাম। বন্ধুরা মেয়ে দেখাতে চেয়েছিল, আমি নিষেধ করেছি। আমার বিশ্বাস, নিশ্চয়ই আমার সম্পর্কে মা সবচেয়ে ভালো চিন্তাটি করবেন। অথচ নারীর চিন্তা মাথা থেকে দূর করতে পারছিলাম না। কোন অচেনা নারীকে মনের মধ্যে এমনভাবে বসিয়েছিলাম যে, সব সময় একটিই চিন্তা থাকতো, তা হলো নারী।

এক সময় নারীপাগল হয়ে নারীদেহ ভোগ করতে বেপরোয়া হয়ে উঠলাম। তাই এক বন্ধুর সহযোগিতায় এক অন্ধকার রাতে টাঙ্গাইল শহরের এক পাশে অবস্থিত নিষিদ্ধ পল্লিতে ঢুকে পরলাম। এক পতিতাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে চরিত্র নষ্ট করলাম।

নারীদেহের স্বাদ পেয়ে সেদিন স্বর্গসুখ পেলাম বলেই মনে হলো। মেয়েটির ঘর থেকে বের হওয়ার সময় আমাদের পাড়ার শ্রদ্ধেয় নজরুলকাকার মুখোমুখি হয়ে গেলে কয়েক সেকেন্ড কেউ কথা বলতে পারলাম না। তারপর কাকাই আমার হাত ধরে সামনের গলির দিকে নিয়ে গেলেন। সেই গলির মাঝামাঝি অবস্থানে এক দরজায় নক করলেন। একটি সুন্দরী মেয়ে বেরিয়ে এলো। পতিতালয়ে এতো সুন্দরী মেয়ে থাকে তা কখনো ভাবিনি।

ভেতরে গিয়ে বসলাম।

কাকা বললেন, তোমাকে এখানে দেখে আমি অবাক হয়েছি।

জবাবে শুধু বললাম, আমিও।

নজরুলকাকার ঘরে সুন্দরী বৌ রয়েছে। তবুও তিনি পতিতালয়ে কেন এসেছেন সে প্রশ্ন আর তাকে করা হয়নি।

তিনি আবার বললেন, কাউকে কিছু বলবে না এবং আমিও বলবো না।

মেয়েটির সঙ্গে কাকা আমার পরিচয় করে দিলেন এবং হন হন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মেয়েটির নাম মিনা। মিনার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তৃপ্তি সহকারে দেখতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ আগেই নারীদেহের স্বাদ নেয়া আমার লোভাতুর দুই চোখ তার দৃষ্টি এড়ালো না। তার ডাকে আবার নষ্ট হলাম।

তারপর পাচশ টাকার একটা নোট ধরিয়ে দিয়ে আবার আসবো বলে বেরিয়ে এলাম।

এরপর কম করে হলেও দশটি রাত তার সঙ্গে কাটিয়েছি।

এর ফলে যে মায়ের সঙ্গে জীবনে মিথ্যা কথা বলিনি সেই মায়ের সঙ্গে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে এ জায়গায়, সে জায়গায় যাবো বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতাম। আমার সহজ সরল মা কোনোদিন জানতেও পারেননি তার সোনার টুকরো ছেলেটার চরিত্র কতোটা নিচে নেমে গেছে।

আমি তখন পতিতা প্রেমে পাগল। সর্বক্ষণ শুধু সুযোগ খুজতে থাকি কখন মিনার কাছে যাবো। বিভিন্ন অজুহাতে মিনার কাছে চলে যেতাম। প্রতিবারই তার জন্য ফুল, প্রসাধন সামগ্রী আর চায়নিজ খাবার নিয়ে যেতাম।

একদিন শাড়িকুটির থেকে একটি জলপাই রঙের শাড়ি কিনে নিয়েছিলাম। সে খুব খুশি হয়েছিল। সেদিন সেই শাড়িটা পরে অপরূপ সাজে সেজেছিল মিনা এবং আমি তাকে দেখে পতিতা ভাবতে পারিনি।

এরপর তাকে নিয়ে খুব ভাবতে শুরু করি। সময়ে অসময়ে তার কাছে চলে যেতাম। জানি না ভালোবাসার টানে কি না। আমাদের সমাজে একজন পতিতাকে সুস্থ সমাজে ফিরিয়ে এনে সামাজিক মর্যাদা দেয়া প্রায় অসম্ভব কাজ। তবুও প্রচণ্ড সাহসিকতার সঙ্গে এই দুরূহ কাজটি করে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। তাকে জানালাম, আমি তোমাকে সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবো। তোমার অতীত, বর্তমান সব ভুলে যাও।

সে বললো, তোমার কষ্ট হবে। তোমার ওপর সমাজের লাঞ্ছনা নেমে আসবে।

বললাম, আমি ওসব নিয়ে ভেবেছি। তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। প্রয়োজনে তোমাকে নিয়ে দূরে কোথাও গিয়ে ঘর বাধবো।

সে বললো, আমাকে স্বপ্ন দেখিও না, আমি স্বপ্ন দেখতে এখন আর অভ্যস্ত নই। তার চেয়ে তুমি সুখী হও।

শেষ যেদিন গিয়েছিলাম সেদিন বিদায়ের সময় মিনা কোনো কথা বলতে পারেনি। শুধু কেদেছে। এতো কান্না কখনো কোনো মেয়েকে কাদতে দেখিনি। শব্দ নেই, শুধু চোখের পানিতে ভেসে যাচ্ছে বুক। মনের মধ্যে কতোটা কষ্ট থাকলে মানুষ এভাবে কাদে তা আমার আন্দাজ ছিল না। সেদিন আবেগ আর ধরে রাখতে পারিনি। আমিও কেদেছি। বুক ভেঙে কান্না এসেছে আমার। পরদিন বুকের মধ্যে সীমাহীন কষ্ট এবং মনের মধ্যে চাপা কান্না নিয়ে বিমানের সিড়িতে পা রেখেছি।

চাকরিতে যোগদান করেই তার কাছে চিঠি দিয়েছি। চিঠি পোস্ট করতে গিয়েছিলাম কুরিয়ার সার্ভিসে। সেদিন খামের ওপরে পতিতালয়ের ঠিকানা দেখে তারা আমার চিঠিটি নেয়নি। মনে খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। তারপর পোস্ট করে পাঠিয়েছি। যাহোক, চিঠিতে লিখেছিলাম, আমার সঙ্গে তোমার জীবন না জড়াতে চাও ভালো। তবে ওই অন্ধকার গলি ছেড়ে সুস্থ জীবনে ফিরে যাও। তোমার পুনর্বাসনের জন্য যতো টাকা দরকার আমি দেবো।

আজও সে উত্তর দেয়নি।

মায়ের কাছে ফোন করেছি, মা ভালো আছেন। ছোট বোনটি বলেছে, দেশের ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসের কারণে আমাকে দ্বিতীয়বার বিদেশ আসতে নিষেধ করতে মা সাহস পাননি। আর নববধূকে রেখে বিদেশ করা মায়ের পছন্দ নয়। কিন্তু এখন বিয়ে না করতে পারায় দুঃখিত নই। আমার চোখে এখন সব সময় জলপাই রঙের শাড়ি পরা মিনাকে দেখতে পাই যাকে পতিতা ভাবতে পারি না। বুকের মধ্যে সব সময় একটা ব্যথা অনুভব করি। এবং অপেক্ষা করি মিনার চিঠির। মনে মনে ভাবি, হয়তো আমাকেও সে বিশ্বাস করতে পারেনি। এসব আমার শস্তা আবেগ ভেবে নিয়েছে।

কিন্তু আমি জানি, এটা কোনো শস্তা আবেগ ছিল না। এখন আমি জানি, পতিতালয়ে গিয়ে আমার চরিত্র নষ্ট হয়নি। আমি নষ্ট হয়েছি তখন, যখন সমাজের ভয়ে আমার ভালোবাসাকে সামনে নিয়ে যাইনি।

রিয়াদ থেকে

ভিয়েনায় বন্ধন

– রুমি রহমান

মাত্র সতেরো বছর বয়সেই বিয়ের পিড়িতে বসতে হলো আমাকে। কিশোরী জীবনের উচ্ছলতাকে অবদমিত করে ঢুকতে হলো সংসার নামে কমপ্লিকেটেড জায়গায়। বিয়ের পনেরো দিন পরেই স্বামী চলে গেলেন প্রবাসে। ভালো করে তাকে চেনার এবং বোঝার আগে আমাকে তার ভালোবাসায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত করে ফিরে গেলেন কর্মস্থলে।

অপেক্ষার পাহাড় সমান বোঝা নিয়ে শুরু হলো নতুন জীবন। কিন্তু ভালোবাসার ঘাটতি ছিল না কোথাও। মা বাবার ভালোবাসা ছিন্ন করে শ্বশুড়বাড়িতেও পেয়েছি সবার স্নেহ-মমতা। স্বামীর ভালোবাসার সঙ্গে তুল্য না হলেও তাদের মমতা নিখাদই ছিল। তারপরও স্বামীর ভালোবাসার জন্য ক্লান্ত পথ চেয়ে থাকা। অবশেষে দীর্ঘ সাড়ে চার বছর পর সুযোগ হলো স্বামীর ভালোবাসার সারাক্ষণের সঙ্গী হতে। বৃটিশ এয়ারলাইন্সের সাড়ে আটটার ফ্লাইটে ইকনমি ক্লাসের নির্দিষ্ট সিটে বসে অদ্ভুত প্রশান্তিতে ছেয়ে গেল দুজনার মনই। অপেক্ষার পালা তাহলে শেষ হলো। এখন শুধুই ভালোবাসা কোনো বাধা নেই। নেই হাজার মাইলের ব্যবধান। হাত বাড়ালেই ছুতে পারছি সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত ভালোবাসার মানুষকে।

আড়াই ঘণ্টা যাত্রা বিরতিতে লন্ডনের হিথরো এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করলো প্লেন। ভালোবাসার মানুষকে কাছে পেয়েও মনে হচ্ছিল স্বপ্নের মতো। সারাক্ষণ তার হাত ধরে হিথরো শপিং সেন্টারে ঘুরে বেড়ালাম হানিমুন কাপলের মতো। যাত্রা বিরতি শেষে আমরা যাত্রা করলাম লন্ডন টু ভিয়েনা-র ফ্লাইটে। ভিয়েনায় পৌছাতে রাত প্রায় সাড়ে বারোটা। এয়ারপোর্ট লাউঞ্জের বাইরে এসে দেখি এখানেও ভালোবাসার বরণ ডালা নিয়ে অপেক্ষা করছে স্বামীর বন্ধুজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা। আরো একবার ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে অবশেষে উঠলাম স্বামীর ফ্ল্যাটে।

আজ প্রায় ছয় মাস হতে চললো আমি স্বামীর সঙ্গে ভিয়েনা-য়। আমার জীবনে এখানেও ভালোবাসার অভাব হয়নি। অন্যান্য ফরেন কান্ট্রি সম্পর্কে যা শুনেছি তার কোনোটাই ভিয়েনার পরিবেশের সঙ্গে মেলে না। এখানকার বাঙালি পরিবারের লোকজন ভালোবাসার দরজা খুলে দিয়ে বসে আছে একে অপরের জন্য। বিদেশের মাটিতে পরিবেশ যতোটা বৈরী হবে ভেবেছিলাম, ভিয়েনা প্রবাসী এই বাঙালিদের নিখাদ ভালোবাসায় আমার ভাবনাগুলো শুধু ভাবনাতেই থেকে গেছে, বাস্তবরূপে কখনোই ধরা দেয়নি। চমৎকার সুন্দর শহর ভিয়েনার মানুষেরও ভীষণ চমৎকার ও হেলপফুল। এখানকার সুশৃঙ্খলতা, পরিচ্ছন্নতা এবং আইনের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা অচিন্তনীয়।

এখানে এসে সব সময়ই মনে হয় পৃথিবী ভালোবাসাময়। এতো ভালোবাসার মাঝে থেকেও এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারি না, জন্মভূমির ভালোবাসা, মায়ের ভালোবাসা, স্বজনদের অকুণ্ঠ ভালোবাসা। তবে এটাই স্বস্তি, ভিয়েনায় খুজে পেয়েছি সবার মাঝে অন্য রকম ভালোবাসার সেতুবন্ধন। তাই প্রিয়জন ছেড়ে থাকার কষ্ট বুকে নিয়েও সুন্দর প্রবাসে থেকে বলতে পারি উদার গলায়, পৃথিবী শুধুই ভালোবাসাময় এবং শুধুই ভালোবাসা ভিয়েনায়। ভালোবাসা দিবসে অনেক অনেক ভালোবাসা প্রবাসী বাঙালিদের জন্য যারা এতো ভালোবাসায় থেকেও দেশের ভালোবাসার জন্য কাঙাল।

ভিয়েনা থেকে

অনেক নাম

– মঞ্জুরুল ইসলাম মিলন

ভালোবাসা এক। কিন্তু এর অনেক নাম। মানুষের যেমন অনেক ডাক নাম থাকে, ভালোবাসারও অনেক ডাক নাম আছে। যেমন :

ভালোবাসা-এর ভালো নাম তা সবাই জানি। ডাক নাম হিসেবে সর্বপ্রথম যে নামটি আসে তার নাম *প্রেম*। প্রেম বেশি দিন লাস্টিং করলে তা *পিরিতি* নাম ধারণ করে। পিরিতি গভীর হলে লোকে তখন বলে অমুকের সঙ্গে অমুকের বড় *ভাব*। ভাবের ওপর সর জমলে তখন তাকে *ডুবে ডুবে জল খাওয়া* বলে। ব্যাপারটি দৈহিক মিলনের দিকে ধাবমান হলে তা *ইটিস-পিটিস* নামে কানাকানি হতে থাকে। যখন তা রাষ্ট্র হয়ে যায় তখন লোকে বলে *ফষ্টিনষ্টি*। আর বিয়ের আগে গর্ভধারণ হলে ব্যাপারটি *লটর-পটর* পর্যায়ে চলে যায়।

ছোট তিন্নিরা

– দে. হো.

সুন্দর মুখের একজন তিন্নিকে হত্যা করা হয়েছে। কারণ জন্মই ছিল তার আজন্ম পাপ। এতো সুন্দর মুখশ্রী নিয়ে মা–বাবার স্নেহ বঞ্চিত পরিবেশে বড় হওয়া, দারিদ্র নামে চাবুকের কষাঘাত খেতে খেতে সে আর পারছিল না সহ্য করতে। তাই চেয়েছিল উপরতলার সিড়ি বেয়ে অনেক উপরে উঠতে দেহ আর মুখশ্রীকে পুজি করে। কিন্তু সে জানতো না যে, তার মতো নিচতলার তিন্নিদের উপরে উঠতে নেই। হোক সে মুখশ্রীতে অপ্সরা। সে খুব দ্রুত উঠতে চেয়েছিল চাদের উচ্চতায়। এজন্য তার এই পরিণতি। তার পরিমিতি বোধ থাকলে এ পরিণতি ঘটতো না ছোট ছোট তিন্নিদের মতো।

আমি এক তিন্নিকে জানি যে এসেছিল গণ্ডগ্রামের মতো নেত্রকোনা নামের এক জেলা থেকে। যে সময়ের কথা বলছি তখন নেত্রকোনা থেকে ঢাকা আসতে সময় লাগতো একদিন। যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল খুবই করুণ। তাই ওই অঞ্চলের মানুষরা এই অঞ্চলের বর্তমান দুর্গম উপজেলা দুর্গাপুরের মতো বিচ্ছিন্ন ভাবতো রাজধানী ঢাকা থেকে নেত্রকোনাকে। নেত্রকোনাই ছিল তাদের জগৎ। ঢাকার জৌলুস তাদের অজানা ছিল।

আমার পরিচিত তিন্নি যখন বিয়ের সুবাদে ঢাকা এলো স্বামীর কর্মস্থলে সংসার করতে তখন সে মাত্র বাইশ বছরের যুবতী। বিএ পাস করেছিল তার নিজ জেলা থেকে। আর বিএড করেছিল তাদের বৃহত্তর জেলা শহর ময়মনসিংহ থেকে। তার বাবা ছিলেন ক্ষুদ্র চাষী অথবা ব্যবসায়ী। তাই চার মেয়ে ও দুই ছেলেসহ সংসার চালাতে হতো খুবই কায়ক্লেশে। খেয়ে, না খেয়ে তাদের পড়ালেখা শিখতে হয়েছে।

ঢাকা এসে আমার পরিচিত তিন্নি জানতে পারলো জৌলুস কাকে বলে এবং কি তার প্রয়োজন। জানতে পারলো নেত্রকোনার মতো প্রসাধনহীন মুখ, এক কাপড় ধুয়ে বার বার পড়া, রঙ ওঠা, হাতাছেড়া ব্লাউজ পরলে, রঙিন টেলিভিশন বা ফৃজ না থাকলে মান থাকবে না স্বামীর সচ্ছল বন্ধু ও তাদের স্ত্রীদের কাছে, এমনকি প্রতিবেশীদের কাছেও।

তাই তার মনে সাধ জাগলো কষ্টার্জিত বিদ্যাকে কাজে লাগাতে, একটু সচ্ছল হতে। কিন্তু উপায় কি? তাদের নেই কোনো উপরওয়ালা মামা–চাচা। সিড়ি ধরা ছাড়া কোনো চাকরি হওয়া সম্ভব নয় তিন্নি তা ভালোভাবেই বুঝতে পারলো। এ কথা তার প্রয়োজনই বলে দিল।

আমি তখন একটি প্রভাবশালী মন্ত্রণালয়ের জুনিয়র আমলা। সে আমাদের বাড়ির পাচ তলায় থাকতো ছোট এক কামরা সাবলেট নিয়ে। আমার সঙ্গে তিন্নির পরিচয় ঘটালো প্রথমে বড় ভাই হিসেবে। স্বামীর মাধ্যমে সে প্রায়ই আমাকে নিমন্ত্রণ করতো তার বাসায় বিকেলের চা খাওয়ার। আমার গিন্নি একজন জাদরেল ব্যাংক অফিসার। বাড়িটি তার ব্যাংকে লোন ও গৃহ নির্মাণ সংস্থার

ঋণে তৈরি। তিনি পছন্দ করতেন না কোনো ভাড়াটিয়ার বাসায় আমার বা তার যাওয়া কিংবা চা খাওয়া। তাই গিন্নির অগোচরে তাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখতাম।

আলাপে বুঝতে পারলাম এ তিন্নি অনেক সপ্রতিভ। পুথিগত বিদ্যায় সীমাবদ্ধ নয় তার জ্ঞান ভাণ্ডার। স্বৈরাচারী এরশাদের টালমাটাল গদির খবর সে রাখে এবং দেশের ও বিদেশের রাজনীতির বিষয়ে প্রচুর মতামত ব্যক্ত করতে সক্ষম। তার এই সপ্রতিভ আচরণ ও নিষ্পাপ মুখ আমাকে আকর্ষণ করে। তাই গিন্নিকে না জানিয়েই তার বাসায় যাওয়া হয় প্রায়ই। তার সংসারের হতদরিদ্র দশা আমাকে বিমুখ করেনি ওখানে যেতে।

তার স্বামী ছিল পেশায় একজন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হিসাব রক্ষক। পেশাগত কারণেই সম্ভবত সে ছিল কিছুটা স্বল্পভাষী। বেশি কথা বলাকে সে মনে করতো অযথা বাক্য ব্যয়।

বয়সের ব্যবধান নিয়েও আমরা দুজনা কথা বলে যাই সমবয়সীর মতো। এভাবে মাস ছয় যাওয়ার পর একদিন তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে আমার কোলে।

কান্না থামলে এক পর্যায়ে সে বললো, বিয়েটা তার অমতে হয়েছে। এ বিয়েতে সে সুখী নয়। তার স্বামীর রসহীন বাক্যালাপ তাকে ভীষণ পীড়া দেয়। সে আরো বললো, আমাকে সে ভালোবাসে। আমাকে ছাড়া সে বাচতে পারবে না।

আমি তার এ কথায় বাকরুদ্ধ হলাম। আমার সঙ্গে তার বয়সের ব্যবধান এক জেনারেশন! আমার মেয়ের চেয়ে সে মাত্র চার পাচ বছরের বড়। কিন্তু তার অকপট কান্নাজড়িত কথা মনে গভীর রেখাপাত করে। এর কারণ হয়তো ছিল আমার বদ্ধ ডোবার মতো জোয়ারভাটাহীন যান্ত্রিক দাম্পত্য জীবন। এ জীবন ছিল আমার মুখরা স্ত্রীর একাধিপত্য ভরা। পান থেকে চুন খসার উপায় ছিল না তার কথার বাইরে।

কিন্তু তিন্নির আকুতি আমাকে ভুলিয়ে দিল আমার অবস্থান, সমাজ-সংসার। তাই জ্ঞান হারালাম, মরে গেলাম। তাকে ছাড়া আমার কিছুই ভালো লাগে না। এক মুহূর্তও তাকে ছাড়া কিছু ভাবতে পারি না। অফিস থেকে দুপুর দুটোয় ফিরে এসে ছুটে যাই তাদের ঘরে। সে আমার জন্য ওৎ পেতে থাকে দুপুরের ঘুম মাটি করে। সরাসরি চলে যেতাম সেখানে। তার বাসায় এ সময় সে একাই থাকতো। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে ঝাপিয়ে পড়তো আমার বুকে। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিতো আমার মুখ। এভাবে আমাদের এক বছর ভালোই কাটলো।

তারপর একদিন আমিই আমার পায়ে কুড়াল মারলাম। আমার নির্লজ্জ প্রচেষ্টায় এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সহায়তায় তার মন্ত্রণালয়ে তিন্নি একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর চাকরি পেল। সচিবালয়ের খুবই লাগালাগি দুই ভবনে চাকরি করি আমরা। ঘণ্টায় ঘণ্টায় টেলিফোনে আলাপ হয় তার সঙ্গে। মাঝে মধ্যে রাস্তায় দেখা হলে আমার গাড়িতে তুলে নিই তাকে।

দ্রুত কাজ শেখার জন্য বন্ধুকে বলে তাকে এক সহকারী সচিবের অধীনে বদলি করে দিই। সে ছিল সুদর্শন।

এরপর তিন মাস না যেতেই একদিন সে অফিসে যাওয়ার পথে আমার গাড়িতে উঠতে অস্বীকার করে।

এর কিছুদিন পর দেখা গেল অফিস থেকে তার বাড়ি ফিরতে দেরি হচ্ছে। সারা বিকেল তার কোনো সাড়া পাই না। কারণ জিজ্ঞাসা করতে একদিন সে জানালো, অফিসে তার কাজ বেড়ে গেছে। তাই ছুটির পরও থাকতে হয়। এভাবে নানান অজুহাতে আমার প্রতি তার আকর্ষণ কমতে থাকে।

বুঝতে পারলাম আমার নিশার স্বপন হয়েছে ভোর। মালা ছিল, তার ফুলগুলি গেছে, রয়েছে ডোর।

বহু সূত্রে খবর পাই সে তার বসের প্রেমে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য। কিন্তু ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরিতে যে অগ্নুৎপাত শুরু হয়েছিল তা থামেনি। মুক্তি পাওয়ার জন্য সচিবালয়ের বাইরে বদলি হয়ে যাই। সেও বাসা ছেড়ে চলে যায় দূরে মালিবাগে।

বছর তিনেক তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। তার এক বান্ধবীর মাধ্যমে জানতে পারলাম ইতিমধ্যে সে তার তিন বসের সঙ্গে ভালোবাসার খেলা শেষ করেছে।

গত মাসে সচিবালয়ে যাই একটি জরুরি কাজে। হঠাৎ আট বছর পর সে আমাকে দেখে কাছে আসে। জিজ্ঞাসা করি কেন সে বার বার ভালোবাসার মানুষ বদলায়।

তার উত্তর, ছোট ছোট তিন্নিদের এভাবেই বাচতে হয়। বসদের সঙ্গে নির্বিরোধ কাজ করার জন্য এবং এনুয়াল কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট বা সংক্ষেপে এসিআর কালিমালিপ্ত না করার জন্য।

নির্বিঘ্ন প্রমোশন ও উপরে ওঠার জন্য এসবই ছিল তার অভিনয়। তবে সে বললো, আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক নাকি শুধু অভিনয়ই ছিল না। এক ধরনের ভালোবাসাই নাকি সেটা ছিল।

ভাবলাম, এটাও এক ধরনের সান্ত্বনা, ছোট ছোট তিন্নিদের দেয়া সান্ত্বনা।

ঢাকা থেকে

এক রাত

– চৌধুরী এস. আলম

আমার মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষা তখন শেষ। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে-ফিরে ও আড্ডা দিয়ে দিন কাটছে নিজ জেলা শহরে। সে সময় শহরে সংঘঠিত একটি রাজনৈতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামার মামলার আসামি হওয়ায় আমাকে কয়েকদিন গ্রামের বাড়িতে পালিয়ে অবস্থান করতে হয় যদিও ঘটনার সঙ্গে আমি জড়িত ছিলাম না।

আমাদের গ্রামের বাড়িতে রমজান আলী নামে একজন কেয়ারটেকার থাকতো সপরিবারে। তার মাধ্যমে বিভিন্ন খবরাখবর সংগ্রহ করতাম।

স্থানীয় থানার একজন জুনিয়র অফিসার ছিলেন আমাদের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়। একদিন তার সঙ্গে দেখা করে সব খুলে বললাম। তিনি আশ্বাস দিলেন, প্রয়োজনে যথাসাধ্য সহযোগিতা করবেন।

একদিন সন্ধ্যার দিকে গ্রামের চৌকিদার একটি চিঠি দিয়ে গেল। চিঠিতে থানার সেই জুনিয়র অফিসার আমাকে জানান, উপর মহল থেকে আমার খোজে গ্রামের বাড়িতে হানা দেয়ার এবং আমাকে পেলেই গ্রেফতার করার নির্দেশ এসেছে। পুলিশ আজ রাতেই আসতে পারে। তাই আমি যেন রাতে বাড়িতে না থাকি।

রমজান আলী সব শুনে বললো, চিন্তা করবেন না ভাইজান। আমি নিরাপদে থাকার ব্যবস্থা করছি।
রাত নয়টার দিকে রমজান আলীর সঙ্গে প্রায় আধা মাইল দূরে বাশবন ঘেরা এক হিন্দু বাড়িতে উপস্থিত হলাম। সে আগেই ব্যবস্থা করে রেখেছিল। বাড়ির কর্তা স্থানীয় স্কুল মাস্টার। সপরিবারে তিনি শহরে বেড়াতে যাওয়ায় বাড়িতে তার এক বিধবা ভাইঝি আর কাজের বুড়ি ছাড়া কেউ ছিল না। একটা টিনের ধরে চাটাইয়ের পার্টিশন দিয়ে তৈরি এক রুমে রমজান আলী আমার বিছানা পেতে দিয়ে বললো, ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে। অসুবিধা নেই। তারপর আমাকে নির্ভাবনায় ঘুমাতে বলে সে ফিরে গেল।
ঘরের দরজা বন্ধ করে পার্টিশনে এ প্রান্তে দড়িবাধা একটা ছোট দরজা নজরে পড়লো।
বিছানায় শুতে যাবো এমন সময় পাশের রুমে শোনা যায় একটি মেয়ের কাতর কণ্ঠ, একটু জল... বুড়িঝি... একটু জল...। বুঝতে পারলাম, বাড়ির কর্তার ভাইঝি। মনে হলো, মেয়েটি অসুস্থ। কিন্তু এখানে তো আর কেউ নেই।
খানিকক্ষণ পর মেয়েটি আবার একটু জল বলে জড়ানো কণ্ঠে ডেকে উঠলো। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে পার্টিশনের ছোট দরজাটির বাধন খুলে দেখি, চাদর গায়ে মেয়েটি আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার পানির বোতল থেকে এক গ্লাস পানি নিয়ে পাশের রুমের মেয়েটির কাছে গিয়ে আস্তে ডাকলাম। চোখ মেলে আমাকে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে গায়ের চাদরসহ উঠে বসলো।
বললাম, আমি আজ পাশের রুমের আছি। রমজান আলী নিয়ে এসেছে।
মেয়েটি তখন স্বগোক্তির করে বললো, ও আচ্ছা। তারপর আমার হাত থেকে পানির গ্লাসটা নিয়ে সবটুকু পান করে আনতো মুখে বসে রইলো।
টিনের বেড়ায় ঝোলানো হারিকেনের আলোয় বোঝা গেল মেয়েটি শ্যামলার মাঝে বেশ সুশ্রী। বয়স বিশের কাছাকাছি।
জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি অসুস্থ?
নিচে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে বললো, খুব মাথা ব্যথা ছিল। এখন ভালো লাগছে।
কি নাম?
অপর্ণা।
হঠাৎ শরীর থেকে চাদর পড়ে গেলে দেখি, তার পরনে শুধু ব্লাউজ আর পেটিকোট। ঘামে ভিজে ব্লাউজটি লেপ্টে আছে ভরাট দুটি বক্ষে।
কেমন যেন একটা তপ্ত শিহরণ জেগে উঠলো ভেতরে। আমার সুপ্ত বাসনা কলি মেলে দিল। তবু একটা সংকোচের দেয়াল ঘিরে থাকে। হঠাৎ সে মুখ তুলে আমার পানে তাকায়। দৃষ্টিতে যেন কিসের আমন্ত্রণ। এমন সময় আকাশে মেঘ ডেকে উঠলো। পরক্ষণে শুরু হলো বৃষ্টি।
বর্ষণ সিক্ত মোহময় পরিবেশ অপর্ণার দিকে আমাকে চুম্বুকের মতো টেনে নিয়ে গেল। পাশে বসে দুহাতে তার মুখখানি তুলে ধরে দেখি, ছলছল চোখ। আমার প্রশ্নবোধক অভিব্যক্তিতে অপর্ণা আমার একটা হাত ধরে তার নরম বুকে চেপে ধরে বললো, এখানে বড় কষ্ট। আমি যে বিধবা।
আমি তার ঠোটে ও গালে চুমুর ঝড় তুলে বললাম, এসো আজ সব কিছু ভুলে এই বৃষ্টি মুখর রাতটি স্মৃতিময় করে তুলি। আবেগে আপ্লুত হয়ে অপর্ণা আমাকে জড়িয়ে ধললো।

তার পিঠে হাত বুলিয়ে ব্লাউজের বোতাম খুলে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিলাম। দুটি উত্তপ্ত দেহ পরস্পরের মাঝে ডুবে গেল সুখের অন্বেষায়। বাইরে রিমঝিম বৃষ্টি এবং আমার শরীরের নিচে অপর্ণার সমর্পণ এক অনাস্বাদিত পুলক বয়ে আনলো।

এক সময় পাশের রুমে ফিরে যেতে উদ্যত হলে অপর্ণা সলাজ ভাবে বললো, আজ না হয় দুজন এক সঙ্গেই ঘুমাই। এক রাতের ভালোবাসা যে এই রিক্ত জীবনে অনেক বড় পাওয়া।

আমি তখন অপর্ণাকে বুকে নিয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন স্থানীয় এমপির কল্যাণে আসামির তালিকা থেকে আমার নামটি মুক্ত হবার খবর পেয়ে শহরে চলে এলাম।

প্রায় ছয় মাস পর পারিবারিক কাজে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে জানাতে পারলাম, নিদারুণ মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে একদিন অপর্ণার মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। পরে তাকে পাবনা মানসিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

হোয়াইট বোর্ড

পোস্ট অফিসে যায় না এমন লোক এ দেশে খুব কম আছে। সেখানে সবাই যায়। ছোট–বড়, আবাল বৃদ্ধ, ছেলে–মেয়ে সবাই। আর যায় নব্য গজিয়ে ওঠা কিছু কবি–সাহিত্যিক (!) তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে। তো এমন কিছু নব্য কবি–সাহিত্যিকদের কাব্য এবং গদ্য লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে আমাদের স্থানীয় একটা পোস্ট অফিসে। এই কবি সাহিত্যিকেরা মনের ভাব প্রকাশ করেছে বিভিন্ন স্টাইলে পোস্ট অফিসের শাদা দেয়ালে কলম এবং পেন্সিল দিয়ে। যেমন নাম ঠিকানাহীন একজন লিখেছে, *তোমার জন্য পাগল হলো কতোজন! আমিও।* তিনি হয়তো আতেল টাইপের কেউ। সদ্য লেখালেখি শুরু করেছেন। তা না হলে এমন কথা কেউ লিখতে পারে! প্রথমে মেয়েটিকে ফুলিয়ে তারপর নিজে ঝুলে পড়েছে ঠিক গ্যাস বেলুনের মতো। কোনো কিছু উদ্বোধনের জন্য যেমন অনেকগুলো বেলুনে গ্যাস ভরে কাঙ্ক্ষিত জিনিসটাকে ঝুলিয়ে ছেড়ে দেয়া হয় ঠিক তেমনি এই আতেল টাইপের নব্য সাহিত্যিক তার প্রিয়ার উদ্দেশে আতেলীয় বাক্য ঝেড়েছে।

আমরা মনীষীদের কথা শুনি, বলি এবং মাঝে মধ্যে মেনে চলার চেষ্টা করি। তাই এ সুবর্ণ সুযোগটাকে কাজে লাগাতে চায় একালের মনীষীরা। যদু, মধু নাম দিলে তো আর মনীষী (!) হওয়া যায় না। তাই নামের ক্ষেত্রেও এসেছে বৈচিত্র। যেমন L.C.M নামের একজন মনীষী (!) লিখেছেন, Hamida is a bad girl. so হামিদা নামের মেয়েদের এড়িয়ে চলুন। কি দরকার খারাপ (!) মেয়েদের সঙ্গে মেশা। আফটার অল মনীষীর বাণী বলে কথা। আর মিশলে নিজ দায়িত্বে মিশুন। কোনো ক্ষতি হলে L.C.M দায়ী নয়।

চারদিকে এতো প্রেম। প্রেম প্রেম খেলা। প্রেম নিয়ে ছিনিমিনি। আরো কতো কি। এসব দেখে প্রেম কর্তৃপক্ষ কেনই বা চুপ থাকবে। তাদের তো একটা দায়িত্ব আছে। যাকে বলে মরাল রেসপনসিবিলিটি। তাই তারাও একটা নোটিশ টাঙিয়ে দিল। যা এ রকম :

প্রেম করা ভালো। তার চেয়ে মুরগি পোষা আরো ভালো। কারণ প্রেমে দুনিয়াটা খাইলো।

–আদেশক্রমে প্রেম কর্তৃপক্ষ

সুতরাং প্রেম করুন ক্ষতি নেই। কিন্তু যদি মুরগি পোষেন তাহলে বিরাট লাভ। পকেটে তো মালকড়ি পড়বেই, সঙ্গে দেশের একটা গুরুদায়িত্ব পালন করতে পারবেন। এ দেশের মানুষের পুষ্টির বড় অভাব। আপনি মুরগির একটা খামার দিলে পুষ্টির সেই ঘাটতিটা পূরণ করতে পারবেন ডিম বেচে।

এমন প্রেম করবেন না, যে প্রেম আপনাকে শেইম এনে দেয়। সুতরাং ওসব প্রেম ব্রেন থেকে ক্রেন দিয়ে উঠিয়ে ড্রেনে ফেলে দিন। দেখবেন সব ঠাণ্ডা। কিন্তু সেই প্রেম যদি ব্রেন থেকে ড্রেনে ফেলতে না পারেন তাহলে অবস্থা টাইট। যেমন সবুজ নামের একজন ছ্যাকা খাওয়া কবি তার প্রেমের পরিণতির কথা লিখেছেন এভাবে –

ভালোবাসার শেষ ফল
বুকে ব্যথা চোখে জল

ভালোবাসবেন ভেবে চিন্তে। এই সবুজের মতো যেন বুকে ব্যথা আর চোখে জল নিয়ে প্রিয়ার কাছ থেকে ফিরতে না হয়।

অল্প কথায়ও যে প্রিয়াকে খুশি করা যায় তার দৃষ্টান্ত রেখেছেন নাম ঠিকানাহীন একজন লেখক। ঠিক এভাবে –

মধুর মতো মিষ্টি তুমি।

এ লোক হয়তো মিষ্টি খেতে খুব ভালোবাসেন। তা না হলে তিনি কখনো প্রিয়ার শরীরের কোথাও ঠোট রেখে মধুর স্বাদ পেয়েছিলেন। এ জন্য হয়তো প্রিয়াকে মধুর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

অন্য একজন নাম ঠিকানাবিহীন কবি (!) তার অভিমানী প্রিয়ার রাগ ভাঙাতে লিখেছেন –

হৃদয় মাঝে যারে দিয়াছো ঠাই
ভুলিতে পারি না তারে দিন রাত্রি তাই।

বড়ই ভালো কথা। প্রেমে রাগ–অনুরাগ, মান–অভিমান থাকবেই। সুতরাং মান ভাঙাতে প্রিয়াকে এমন দুটো লাইন শুনিয়ে দিন না।

সবুজ, যার কাব্য প্রতিভার পরিচয় কিছুক্ষণ আগে পেয়েছেন। এখানেও পাবেন। তবে তার আগে একটা কথা বলে নিই। লোকে বলে প্রেমে না পড়লে আর ছ্যাকা না খেলে নাকি কবি হওয়া যায় না। এই সবুজ বোধহয় তার দুটো কোর্সই সম্পন্ন করেছে। তাই সে লিখেছে –

ভালোবাসা মহাপাপ
প্রেম তার অভিশাপ

সবুজের কথায় বোঝা যাচ্ছে, প্রেম ভালোবাসা দুটোই খারাপ জিনিস। তাই বলছি, কেউ যদি এই দুটির একটিতে বা দুটিতেই ইনভলভড থাকেন তাহলে আজই তা পরিহার করুন। না হলে সবুজের

কথা সত্যি হয়ে যাবে। সারা জীবন আপনাকে ভালোবাসার পাপ আর প্রেমের অভিশাপ নিয়ে কাটাতে হবে।

কিছুদিন আগে যখন জোড়াকল বাজারে গেলাম সেখানেও একটা দেয়াল লিখন আমার নজর কাড়লো। অবশ্য এটাকে দেয়াল লিখন না বলে পথকাব্য বলাই শ্রেয়। কারণ এটা চার লাইনের একটা কবিতা। কেউ হয়তো তার প্রিয়ার উদ্দেশ্যে লিখেছে। পথে যাওয়ার সময় পড়ে নেবে অথবা সবাইকে লেখক তার অন্তরের ভালোবাসা জানিয়েছে। আসুন কবির কবিতাটি একটু শোনা যাক –

Man loves money
Bee loves honey
Rose loves dew
I love you.

আহা। এর চেয়ে ভালো করে ভালোবাসার কথা প্রিয়াকে বলা যায় কি না আমার জানা নেই। আমার প্রিয়াকে এভাবে বলার চেষ্টা করবো। আপনারাও কি?

এবার আসা যাক আমার কথায়। আমাদের চুনকাম করা চার তলায় আমার প্রিয়াকে রাগানোর জন্য লিখেছিলাম –

শ–য় আকারে শা, র, ম–য় হ্রস্ব ইকারে মি, ন, ফ–য় আকারে ফা, জয় হ্রস্ব ইকারে জি, ল।

সবটা কেটে সে লিখেছিল, আপনি ফাজিল। এভাবে আমাদের কাটাকাটি লেখালেখি চলেছিল বেশ কিছুদিন। তারপর আর ওই এক কথা লিখতে ভালো লাগেনি। তাই শুরু করলাম অন্য একটা শব্দ লেখা। সবাই তার প্রিয়াকে যে কথা বলে তা লিখেছিলাম ভালোবাসার ওই হোয়াইট বোর্ডে। তবে তা অবশ্যই নিজস্ব স্টাইলে। তা হলো –

ভ–য় আকারে ভা, ল–য় আকারে লো, ব–য় আকারে বা, স–য় হ্রস্ব ইকারে সি।

এর জবাব আমি পেয়েছিলাম ওই বোর্ডে আমিও লেখা দেখে। So আমরা বেশ ভালোই আছি, যারা ভালোবাসার কথা শাদা দেয়ালে লিখি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
খালিশপুর থেকে

সালমান শাহ

- Z.R

সালমান শাহ নাম শুনলে সবাই এক ডাকে চিনবেন। নায়ক সালমান শাহ যিনি এক সময়ে বাংলাদেশের জনপ্রিয় নায়ক ছিলেন। প্রতিটি মানুষের মুখে মুখে ছিল যার নাম তার মৃত্যুর পর কেউ কেউ আত্মাহুতি দিয়েছেন। অনেকে কেদে বুক ভাসিয়েছেন আবার অনেকে তার স্মৃতিকে বুকে আগলে রেখে আজও বেচে আছেন। আর এ কাজগুলো যারা করেছেন তাদের বেশির ভাগ মেয়ে।

আমি এখন ঠিক তেমনি একজনের কথাই লিখবো। যার সঙ্গে আমার প্রায় দীর্ঘ এক বছরের সম্পর্ক ছিল। আমি তাকে সাথী বলে ডাকতাম। আকর্ষণীয় চেহারা। কিন্তু অন্য সবার কাছে সে সালমান শাহ বলে পরিচিত ছিল। পরিচিতির কারণটা হচ্ছে, সেই অমর নায়ক সালমান শাহ যার বিভিন্ন

কোয়ালিটির ভিউ কার্ড, বড় ছবি, ক্যাসেট ইত্যাদি কিনতো সে। এছাড়াও তার সালমান শাহ্ ভক্তির নানান কারণের জন্য স্থানীয় মার্কেটের প্রতিটা দোকানে, সাধারণ মানুষের কাছে এবং তার স্কুলে সালমান শাহ্ বলে পরিচিতি লাভ করেছিল। মজার বিষয় হলো, এতো পরিচিতির পরেও তাকে কখনো চিনতাম না। কিন্তু তার সঙ্গে আমার সম্পর্কের শুরু হয় হঠাৎ করেই।

আমি কলেজে সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। একদিন সকাল নয়টার দিকে কলেজে যাবো। তাই বাড়ির সামনের টিউবওয়েল থেকে ফ্রেশ হচ্ছি। এমন সময় সে আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার চোখে চোখ পড়তেই বলে ফেলি, ভালো আছো।

সে কথার উত্তর দেয় আর আমার কথা জানতে চায়। এভাবেই শুরু। এরপর প্রায়ই সে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে তার বান্ধবীর বাড়িতে যেতো আর আমার সঙ্গে কথা বলতো। এভাবে তাকে আমার ভালো লেগে যায়। ভালোলাগা থেকে ভালোবেসে ফেলি। সেই আমাকে আমন্ত্রণ জানায়। এক সময় তাকে না দেখলে ভালো লাগতো না। চিঠিপত্র প্রায়ই দেয়া-নেয়া হতো। তার বান্ধবীর বাড়ি আমাদের বাড়ি। তার স্কুলের সামনে এবং নদীর কূলে প্রায়ই আমাদের দেখা হতো। এমনি একদিন বিকাল পাচটার দিকে নদীর কূলে তার সঙ্গে আমার দেখা কোনো শেডিউল ছাড়াই। এসেছে তার বান্ধবীর সঙ্গে। তার বান্ধবীর বাড়ি আবার আমাদের বাড়ির পাশেই। তাই তাকে রিকোয়েস্ট করি তার বান্ধবীর বাড়িতে রাতে থাকার জন্য। রাতে দেখি সত্যি সত্যি সে রয়েছে। তখন তাকে আমাদের বাড়িতে আসতে বলি।

রাত আটটার দিকে আমার রিডিংরুমে একা বসে পড়ছি। এই সময় সে আসে এবং আমার পাশে বসে। আমি কিছুটা শিহরিত হই। জীবনে প্রথম কোনো মেয়ে আমার পাশে বসে। কিছুটা ভয় লাগছিল। তবুও তার স্পর্শ পেতে মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আর তখনই বিদ্যুৎ চলে যায়। একটু করে সাহস বাড়তে থাকে এবং আমার হাত বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তাকে কাছে টেনে জড়িয়ে ধরি। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিই। সেদিন আরো অনেক কিছুই ঘটতে পারতো। কিন্তু তাকে পাবো এবং আমার ভালোবাসাকে পবিত্র রাখবো বলে এর থেকে বেশি দূর এগোয়নি।

এ রকম আরো একবার তার চাচাতো ভাইদের বাড়িতে ঘটেছিল। ভালোবাসার পবিত্রতা রক্ষা করতে গিয়েই আজ পবিত্র দুঃখ পাচ্ছি। আমি এস্টাবলিশড না বলে আজ সে অন্য ঘরের ঘরনী। সে যে ছলনাময়ী ছিল তা ঠিক এক বছর পর জানতে পারলাম। যদিও এই এক বছরের মধ্যে তার সঙ্গে আমার সম্পর্কের ভাটা পড়েছিল বেশ কয়েকবার। একবার সালমান শাহ্-এর ছবি কিনতে নিষেধ করায় আমার ওপর ক্ষেপে গিয়েছিল। আরো অনেক কিছু ঘটেছিল। আবার সেই শুধরে নিয়েছিল। কিন্তু সেগুলো নিয়ে ভাবতাম না। কারণ ভাবতাম সে শুধু আমার। এই ভাবনায় আজ আমার দুঃখ। সেদিন যদি আমার ভালোবাসার পবিত্রতা নষ্ট করতাম তাহলে হয়তো আজ সে আমাকে ছেড়ে যেতে পারতো না।

স্বার্থপরের মতো সুখের সন্ধানে সে বিয়ে করেছে। এই এক বছরের মধ্যে আমি এইচএসসি পাস করেছি। ম্যাথমেটিকস অনার্সে ভর্তি হয়েছি। কিন্তু তাকে আর পাইনি। তার বিয়ের পর পরই হারিয়ে গেল আমার সাথী নামের সালমান শাহ্। কিন্তু এখনো তাকে ভুলতে পারি না। শুনেছি, স্বামী-সংসার

নিয়ে সে খুব সুখে আছে। তাই আজ এই ভ্যালেনটাইনস ডে–তে তাকে জানাই আমার ভালোবাসা ও আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন।

ঢাকা থেকে

পারফিউম

– সুরভি

সবার চোখকে ফাকি দিয়ে প্রায় দুই পৃষ্ঠার একটি চিঠি লিখলাম। কিন্তু কাল পোস্ট করবো, রাখি কোথায় চিঠি। তাই ঘুমানোর আগে লেটার প্যাডটি চুপি চুপি সোফার নিচে রেখে দিলাম। সকালে ঘুম থেকে উঠেই লেটার প্যাডটি সোফার নিচে থেকে বের করলাম। কিন্তু প্যাডের কিছু অংশ ভেজা। সন্দেহ হলো।

তাই নাকের কাছে নিতেই বুঝলাম কি ঘটেছে। কারণ শীতে চিকা (ইদুর জাতীয় প্রাণী) সারা রাত ঘরের সোফার নিচে নাড়াচাড়া করে।

মেজাজটা এতো খারাপ হলো। শেষ পর্যন্ত এখানে বাথরুম করলো!

তাড়াতাড়ি পারফিউম স্প্রে করলাম। কিন্তু গন্ধ তো যায় না। কিন্তু আবার লেখাও সম্ভব নয়। তাই পোস্ট করলাম পারফিউম দেয়া চিঠি।

ও চিঠি পেয়ে জানালো, অনেক দিন পর তোমার এতো মিষ্টি চিঠি পেলাম।

আর আমি তো হেসেই মরি।

ঠিকানাবিহীন

সেরা

– বাবু

ভালোবাসার সংজ্ঞা খুজে পাওয়া বিরল। তাই বলে ভালোবাসতে তো আর মানা নেই। ভালোবাসা সংজ্ঞাহীন, ভালোবাসা দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। অথচ অনুভূতিময়। হৃদয়ের গভীরে ভালোবাসার জন্ম বলে একে বলে হৃদয়জাত। সমস্ত আবেগ, সমস্ত ভালোলাগা একই সিদ্ধান্তে বেড়ে ওঠে। মনের গভীরে সব কিছু একাকার হয়ে যায়। সেই মানুষটি হয়ে ওঠে দুনিয়ার প্রিয়তম সম্পদ।

ম্যুর তার নীতিশাস্ত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, এমন অনেক জিনিসই আছে যেগুলো স্বয়ং ভালো। এগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ হলো ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ ও নান্দনিক উপভোগ। ভালোবাসার কারণেই রবীন্দ্রনাথ লাবণ্যকে, শরৎ পার্বতীকে, বঙ্কিম রোহিনীকে, সমরেশ মালিনীকে, বুদ্ধদেব বাবলীকে, হুমায়ুন রূপাকে আবিষ্কার করেছিলেন। আর আমি আবিষ্কার করেছি ভালোলাগা, ভালোবাসার মাকে যার মাঝে আমার স্বপ্নের শুরু, যার মাঝেই আমার স্বপ্নের শেষ।

ছয় ভাই, এক বোনের মধ্যে সবার ছোট হওয়াতে আমার প্রতি মায়ের ভালোবাসা ছিল বিশাল আকাশের মতোই। কাউকে যদি ভালোবেসে থাকি সে হলো মা। মায়ের কাছেই প্রথম ভালোবাসা শব্দটি উপলব্ধি করতে শিখেছি। খুব ছোটবেলা থেকেই মা আমাকে নিজ হাতে গোসল করিয়ে মাথায় সিথি কেটে স্কুলে পাঠাতেন। প্রতিদিন পকেটে পুরে দিতেন এক টাকার একটি নোট।

যখন ক্লাস টু–তে পড়ি, ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম না হওয়াতে খুব কেদেছিলাম। আমার মা আচল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে যে উপদেশমূলক সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছিলেন, পরে তা আমার জীবনে ম্যাজিকের মতো কাজ দিয়েছিল, দিচ্ছে এবং দেবে।

মায়ের ভালোবাসা আমার জীবনে বেশিদিন টিকলো না। বাস্তবতার কঠিন নিয়মে মাকে ছেড়ে বোনের বাসায় চলে আসতে হয়েছিল।

মাকে ছেড়ে যেদিন প্রথম বাড়ি ছেড়েছিলাম সেদিন হাউমাউ করে কেদেছিলাম। আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মা বলেছিলেন, তুই একদিন অনেক বড় হবি। সারা দুনিয়ায় তোর নাম ছড়িয়ে যাবে। সেদিন আমার জন্য মায়ের যে কান্না দেখেছি তা আজও আমার ভেতরটাকে কাদায়।

সারাক্ষণ মায়ের জন্য কাদতাম। রাতে আকাশের তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে মায়ের কথা ভাবতাম। তাদের কাছে মিনতি করতাম মায়ের কাছে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু আমার কান্না দেখে ওই আকাশের তারাগুলো হো হো করে হাসতো।

মায়ের কাছে চিঠি লিখলে সেই চিঠি পড়ে মা শুধুই কাদতেন। বাড়ির সবাইকে বলে বেড়াতেন দেখো, আমার মানিক, আমার সাত রাজার ধন, আমার কাছে চিঠি লিখেছে।

মাঝে মধ্যে ছুটি পেলে মায়ের কাছে যেতাম। কি যে ভালো লাগতো সেই ক্ষণগুলো। তখন ভাবতাম ইশ! যদি সারাটি জীবন এমনিভাবে মায়ের ভালোবাসা পেতে পারতাম।

কিন্তু নিয়তি বড়ই নিষ্ঠুর। সে ছিনিয়ে নিতে চায় আমার মায়ের ভালোবাসা। নিয়তি তো জানে না, মায়ের ভালোবাসা ছাড়া আমি বাচতে পারবো না। পৃথিবীর রাজত্ব, সুন্দরীদের ভালোবাসা চাই না আমি। আমি চাই আমার মায়ের ভালোবাসা।

আজ আমি এতো বড় হয়েছি, তাও বাড়ি গেলে আমাকে মা গোসল করিয়ে সেই ছোটবেলার মতো মাথায় সিথি কেটে দেন। নিজ হাতে আমাকে ভাত খাওয়ান, নিজ হাতে পিঠা তৈরি করেন। আমার জন্য অস্থির হয়ে যান। ঈদের সময় আমার সঙ্গে কোলাকুলি করেন। সালামি বাবদ দেন সবচেয়ে মোটা অংকের টাকাটি।

আমিও মাকে ভাত মেখে লোকমা করে খেতে দিই। মায়ের মাথায় তেল এবং চিরুনি দিয়ে আচড়িয়ে নিজের মতো করে সাজাই। সাজাবো না? কারণ মা যে আমার ভালোবাসা, আমার জীবন, আমার মরণ।

মায়ের চোখে আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মানুষ। মায়ের কোলে মাথা রেখে একদিন বলেছিলাম, মাগো আমার বিয়ের সময় দুটো লাল বেনারসি শাড়ি কিনবো, একটি তুমি, অন্যটি আমার বৌ পরবে।

মা হেসে বলতেন, আমার পাগল ছেলে। আমি কি তোর বৌ দেখে যেতে পারবো!

মাকে আমি কোথাও যেতে দেবো না। আমার ভালোবাসা দিয়ে মাকে চিরজীবন বাচিয়ে রাখবো। মা চলে যাওয়া মানে একটি ভালোবাসার মৃত্যু হওয়া।

খুব ভয় হয়, মা কখন আমাকে, আমার ভালোবাসাকে নিঃশেষ করে দিয়ে চলে যায়। তাই যাতে চলে যেতে না পারে সে জন্য প্রতিবার বাড়ি গিয়ে মাথা ছুইয়ে দিব্যি দিই। মা আজও কথা রেখেছে।

এবারের ভালোবাসা দিবসে আমার বৃত্তির টাকা দিয়ে মাকে একটি সোনার চেইন দেবো। মায়ের কপালে চুমু দিয়ে বলবো, হ্যাপি ভ্যালেন্টাইনস ডে টু ইউ। সারাটি দিন মাকে নিয়ে পৃথিবীর এপাশ থেকে ওপাশে চষে বেড়াবো। পৃথিবীর সবাইকে চিৎকার করে বলবো, দেখো আমার ভালোবাসা। আমার ভালোবাসা দেখে পৃথিবীর সবাই তখন হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরবে।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট একটা কথা বলেছিলেন যে, *আমাকে তোমরা একটি ভালো মা দাও, আমি তোমারদেকে একটি ভালো জাতি দেবো।* আজ যদি নেপোলিয়ন বেচে থাকতেন তাহলে তার কাছে আমার মাকে দেখিয়ে বলতাম, এই সেই মা যাকে দিয়ে তুমি একটি ভালো জাতি গড়তে চেয়েছিলে।

আমি কখনো কোনো মেয়ের ভালোবাসা পাইনি। পাইনি বন্ধুর ভালোবাসা, পাইনি বাবার, ভাই–বোনদের ভালোবাসা। তাই ভালোবাসা বলতে যা বুঝি তা হলো আমার মায়ের ভালোবাসা।

আমার মা পৃথিবীর সেরা মা। আমার ভালোবাসা পৃথিবীর সেরা ভালোবাসা।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান ভালোবাসা কার দখলে? সহজেই বলবো, আমার দখলে। কারণ এটা আমার মায়ের ভালোবাসা।

চট্টগ্রাম থেকে

ভাব সম্প্রসারণ

– শামসুল হক হাওলাদার

ভ্যান গাড়িতে উঠে নানান প্রকার চিন্তা–ভাবনা করছি, এ কোন জায়গায় এসে পড়লাম। রাস্তাঘাট খুবই খারাপ। রিকশা, গরুর গাড়ি ও ভ্যান গাড়ি এলাকার প্রধান বাহন। কাচা রাস্তা, বৃষ্টির দিনে এক হাটু কাদাজলে একাকার হয় রাস্তা। কাদা–মাটির পথে গরুর গাড়ি ক্যাচর–ম্যাচর করে চলে। আমার মতো যারা নতুন এ গাড়িতে চড়ে তাদের প্রাণটা থাকে হাতে।

ভ্যানচালক জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাবেন স্যার?

বললাম, জামিরতা কলেজ।

নতুন চাকরি মনে হয়?

হ্যা।

নতুন এসেছেন, একটু সাবধানে থাকবেন।

তার মানে?

তার মানে হচ্ছে, নতুন কেউ এলেই মেয়েরা তার প্রেমে পড়ে। যে কলেজে যাচ্ছেন সে কলেজের ম্যাডামকে এক ছাত্র বিয়ে করেছে প্রেম করে।

আমি তো আর ম্যাডাম না যে, আমার সঙ্গে প্রেম করবে, বললাম ভ্যানচালককে।

সে বললো, তারপরও সাবধানে থাকবেন।

আচ্ছা থাকবো। বলে ভাবনার সাগরে ডুব দিলাম। মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই মহান উক্তি, *প্রেমের ফাদ পাতা ভুবনে। কে কোথায় ধরা পড়ে কে জানে।* সারা জীবন প্রেম বঞ্চিত মানুষ আমি। যদি এখানে এসে প্রেম পেয়ে যাই মন্দ কি? তারপরও কথা থাকে। প্রেম মেলে না যথাতথা।

কলেজ বোর্ডিংয়ে থাকি। সবাই আমাকে *ঢাকাইয়া স্যার* বলে ডাকে। নিয়োগপত্র পাবার আগের অস্থায়ী ঠিকানা ছিল ঢাকার চামেলিবাগ। চাকরির সময় ওই ঠিকানাই ব্যবহার করেছিলাম। তাতেই ঢাকাইয়া হয়েছি। কয়েকদিনের মধ্যেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভাব হয়ে গেল।

বিকেলে পৃন্সিপাল স্যারের ছেলে সালামকে নিয়ে যমুনার পাড়ে বেড়াতে যাই। এ ছেলেই কলেজের ম্যাডামকে বিয়ে করেছে। ছেলে হিসেবে সালাম খুবই অমায়িক ধরনের। তার কাছে ম্যাডামের প্রেমের গল্প শুনেছি। সহকর্মী মাসুদ করিমসহ কোনো বিকেল কাটে বাজারের ডা. মাসুদ সাহেবের চেম্বারে আড্ডা দিয়ে।

একদিন বিকেলে কলেজ বোর্ডিংয়ে শুয়ে আছি। হঠাৎ দরজার টোকা পড়লো। রুমে আমরা তিনজন থাকি। অর্থনীতির সৈয়দস্যার, যুক্তিবিদ্যার মাসুদ করিম আর আমি বাংলার প্রভাষক। জুনিয়র হিসেবে দুয়ার খোলার দায়িত্ব আমার। দরজা খুলে দেখি ফার্স্ট ইয়ারের একটা মেয়ে দাড়িয়ে আছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি চাও?

মেয়েটি বেশ সেজেগুজে এসেছে। কলেজের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটি। বললো, ভেতরে আসবো স্যার?

করিমস্যার বলেছিলেন, ঢাকাইয়া, রুমে কোনো মেয়েমানুষ ঢুকিও না।

তাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম করিমস্যারের দিকে।

স্যার বললেন, কি চায়?

আমি মেয়েটিকে বললাম, কি চাও তুমি?

একটি ভাজ করা কাগজ আমার হাতে দিয়ে বললো, একটা ভাব সম্প্রসারণ লিখে দিতে হবে স্যার। এই নিন।

অজানা আতংকে প্রাণটা কেপে উঠলো। কি লেখা আছে এ ভাজ করা কাগজে কে জানে। না দেখেই তাকে বললাম, যাও লিখে রাখবো। মেয়েটা চলে যাওয়ার পর কাগজের ভাজ খুললাম। তাতে লেখা আছে –

চোখে যদি বালি পড়ে তাহলে চোখ ব্যথা করে,
চোখে যদি কারো চোখ পড়ে তাহলে কি করে?

করিমস্যার বললেন, কি ব্যাপার, প্রেমপত্র নাকি?

আমি কাগজটা তার হাতে দিয়ে বললাম, না, তেমন কিছু না। একটা ভাব সম্প্রসারণ লিখতে দিয়েছে।

করিমস্যার লেখাটা পড়ে বললেন, এমন ভাব সম্প্রসারণ তো কোনোদিন পড়িনি। এটা আবার *প্রেম সম্প্রসারণ* না তো?

বললাম, তা যাই হোক। এখন কি করবো সেটা বলে দিন। যদি না দিই বলবে, স্যার পারে না। দিলে সত্যি কথাটাই লিখবো।

করিমস্যার বললেন, যা মনে হয় লিখো। তবে কোনো প্যাচে পড়ো না যেন।

সত্যি কথাই লিখে দিলাম *চোখে যদি কারো চোখ পড়ে তবে সে হয় তার প্রেমে পড়ে নয়তো সারা জীবন জ্বলে মরে।*

তারপর লক্ষ্য করতাম, ক্লাসে অপলক দৃষ্টিতে সে চেয়ে থাকে। রোল কল করলে উপস্থিত দিতে ভুলে যায়। একদিন বাড়িতে যাওয়ার নিমন্ত্রণ এলো।

করিমস্যারকে বললাম।

তিনি বললেন, তোমার খবর হয়ে গেছে।

কলেজের পিয়ন কার্তিককে দিয়ে মাঝে মধ্যে বাজার-সদাই করাই। ওর সঙ্গে আমার খুব ভাব। সে একদিন বললো, স্যার, একটা কথা বলবো, রাগ করবেন না তো?

বললাম, বলো।

স্যার, আপনারে আমাদের এলাকায় বিয়ে করিয়ে দিই।

আমি বললাম, ঘটকালিও করো নাকি?

সে বললো, না স্যার, ফার্স্ট ইয়ারের ওই সুন্দরী মেয়েটা আমাকে ধরেছে। আপনাকে নাকি তার খুব পছন্দ হয়েছে। আপনি যদি রাজি থাকেন তবে আমার কাছে বলতে বলেছে।

আমার মাথা গরম হয়ে গেল। নতুন চাকরি, শেষে না চাকরিটাই যায়। মনে পড়লো ওই ভ্যানচালকের কথা। শেষে না একটা কেলেংকারিই হয়ে যায়।

তাই কার্তিককে বললাম, দেখো, সে আমার ছাত্রী, আমি তার স্যার। তাকে আমি স্নেহ করি। কিন্তু ভালোবেসে বিয়ে করতে পারি না। তুমি ওকে বলো, সে যেন এসব চিন্তা না করে।

আমার সাজেশন শুনে কার্তিককে সে বলেছিল, এমন কতো শিক্ষক দেখলাম ছাত্রীর সঙ্গে প্রেম করে। ছাত্রীকে নিয়ে রাতের আধারে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। প্রেম না করলে বিয়ে করুক।

প্রেম এবং বিয়ে এ দুটোর কোনোটাই করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি সুযোগ খুজছিলাম বিদেশ অথবা ঢাকায় ফিরে আসতে। কিছুদিনের মধ্যেই সে সুযোগ চলে এলো। আমার বিক্রমপুর, কে.বি. ডিগ্রি কলেজে চাকরি হয়ে গেল। হঠাৎ করেই শাহজাদপুরের জামিরতা কলেজ ছেড়ে চলে এলাম। চলে আসার দিন মেয়েটার সঙ্গে দেখা হয়নি। ওই দিন মেয়েটা কলেজে আসেনি।

কিছুদিন পর বাড়ির ঠিকানায় একটা চিঠি পাই। ভাবছিলাম করিমস্যারের চিঠি। কিন্তু চিঠি খুলে দেখি সে মেয়েটির চিঠি।

খুব আবেগ দিয়ে লিখেছে, আপনার লোমশ বুকে একটু স্থান পেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তা পেলাম না।

চিঠি পড়ে মেয়েটার জন্য কেমন যেন মায়া জমে গেল। ভাবলাম শাহাজাদপুর ফিরে গিয়ে মেয়েটাকে ঘরের বৌ করে নিয়ে আসি। কিন্তু ততোক্ষণে যমুনার পানি যেমন অনেক গড়িয়ে পড়েছে, আমার জীবনেও বিরাট পরিবর্তন এসেছে।

চিঠিটা টেবিলের ওপরেই ছিল। আমার স্ত্রী সেটা পেয়ে অগ্নিশর্মা হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, এ চিঠি কে লিখেছে?

যা সত্যি তাই বললাম আমি। কিন্তু আমার স্ত্রী কিছুই বিশ্বাস করলো না।

সে বললো, ছিঃ ছিঃ ছিঃ কলেজের ছাত্রীর সঙ্গে প্রেম করছো। তাহলে তাকেই বিয়ে করলে না কেন? পোড়াকপাল আমার।

বললাম, পোড়াকপাল তোমার নয়, পোড়াকপাল আমার। তা না হলে তোমাকে বিয়ে করবো কেন? তবে তোমার সঙ্গে ওই মেয়েটার এক জায়গার মিল আছে।

কিসের মিল?

তোমার চোখের চাহনির সঙ্গে ওর চোখের চাহনির হুবহু মিল আছে। তাই প্রথম দেখাতেই তোমাকে আমার পছন্দ হয়ে যায়।

স্ত্রী আরো খেপে গিয়ে বললো, আমার চোখ কিছু না, ওই মেয়ের চোখই সব। সে টুকরো টুকরা করে চিঠিটা ছিড়ে আমার মুখের ওপর ফেলে দিয়ে বললো, কাগজ–কলম নাও।

আমি শান্ত সুবোধ ছেলের মতো কাগজ–কলম নিলাম।

বললো, লেখো, আমি বিয়ে করেছি। তোমাকে আমি ভালোবাসি না। তুমি আর কোনোদিন আমার কাছে চিঠি দেবে না।

ডিভোর্স লেটার লেখার মতো লিখিয়ে নিয়ে আমার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে চিঠিটা সেই পোস্ট করে দিল। জানি না সে আরো কিছু লিখেছিল কি না। সে পত্র পেয়ে জানি না মেয়েটা কতো কষ্টই না পেয়েছে। আমাকে নিষ্ঠুর ভেবেছে।

তারপর আর কোনোদিন চিঠি সে লেখেনি। বহুদিন পর এবার ভ্যালেন্টাইনস ডে–তে আমাদের সে চিঠি প্রাপ্তির দশ বছর পূর্ণ হবে। ১৯৯৩ সালে তার কাছ থেকে চিঠি পেয়েছিলাম। আজ সে কোথায় আছে জানি না। সে যায়যায়দিন পড়তো। এখনো যদি পড়ে থাকে তবে আমার এ লেখার মাধ্যমে তাকে বলছি, তোমাকে জানাতে চাই, ওই চিঠি আমি লিখিনি। ২০০৩ সালের ভালোবাসা দিবসে তোমার প্রতি জানাচ্ছি ফুলেল শুভেচ্ছা। তুমি ভালো থেকো যমুনা পাড়ের মেয়েটি।

আজ এতোদিন পরে আমি ভাব সম্প্রসারণ করলাম!

কি আশ্চর্য!

কুসুমপুর, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ থেকে

শূন্য

সে ছিল আমার চাচাতো বোন। মনে পড়ে ১৯৪৪ কিংবা ১৯৪৫ সালে আমি তখন ক্লাস থৃ–র ছাত্র। আমিই প্রথম তাকে স্কুলে নিয়ে গেলাম। ভর্তি করালাম। সঙ্গে চাচাও ছিলেন। আমার এসএসসি পর্যন্ত তাকে আমিই সঙ্গে করে স্কুলে নিয়ে যেতাম। তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক সব সময়ই ভালো থাকতো। একটু–আধটু মন কষাকষি হতো না এমনটা নয়। তবে তা ক্ষণিকের। যেমন বৌচি খেলতে

গেলে লাগতো। গোল্লাছুট, আরো অনেক খেলাই বাড়ির পেছনের মাঠে গিয়ে আমরা খেলতাম। তখনই একটু–আধটু ঝগড়া লাগতো। আমরা তখন সকল ছেলেমেয়েরা প্রায় সকল ধরনের খেলা একই সঙ্গে খেলতাম। তবে সে বেশ চিকন ছিল। তাই ভালো দৌড় দিতে পারতো। আমি ছুই ছুই করেও তাকে ধরতে বা ছুতে পারতাম না।

যাহোক, অনেক দিন গেল। অনেক রাত গেল। বৃটিশ গেল, পাকিস্তান এলো। জাপানে নাগাসাকি ও হিরোশিমা–র বর্বরোচিত হত্যার ইতিহাস হলো। আমাদের জীবন থেকেও অনেক বছর চলে গেল। কলেজে পড়ার জন্য বাড়ি থেকে চলে এলাম। কলেজের পাশেই লজিং থাকতাম। কলেজে পড়তে এসেই নিজেকে অন্যভাবে আবিষ্কার করলাম। তাকে না দেখলে যেন আমার ভালো লাগে না। সে ছাড়া আমি যেন একা বড় একা।

কতো রাত তার কথা ভাবতে ভাবতে শেষ হয়েছে তা আজও অজানা। বাড়িতে গেলে তার সঙ্গে দেখা হলে কেমন লেগে উঠতো তা বুঝতে পারতাম না। চিন্তা করলাম, তাহলে কি আমি তাকে...?

না, কোনো উত্তর পেলাম না। চারদিকে শুধু শূন্যতাই দেখলাম। আমার প্রতি তার দূরত্ব অনেক কম অনুভব করলাম। এভাবে আরো অনেক দিন কেটে গেল। আমি বিএ ক্লাসে উঠলাম।

তাকে দেখতে এখন আর আগের মতো মনে হয় না। সে যেন এখন একটু অসাধারণ, যেন একটু দূরের, একটু ভিন্ন। তার দেহের প্রতিটি অঙ্গই যেন আলাদা সৌন্দর্য প্রকাশ করছে। প্রতিটি অঙ্গেরই যেন আলাদা ব্যাখ্যা রয়েছে। তার চোখের দিকে আগের মতো তাকানো যায় না। তখন কেন যেন নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। মনে হয় আমি যেন এক লক্ষ্যহীন নাবিক। কোনো ক্রনোমিটার ছাড়াই যেন সাগরে পাল তুলেছি। জীবনতরী যেন অচেনা পথেই ছুটছে। কূলে ফেরার কোনোই সম্ভাবনা নেই।

তার বিয়ের কথা চলছে। নিজেকে খুব অসহায় মনে হচ্ছে। কিছুই বলতে পারছি না। সে একদিন বললো, আমার বিয়ে করতে ইচ্ছা করছে না। আমার ইচ্ছা হচ্ছে কোথাও পালিয়ে যাই।

বললাম, কাউকে পছন্দ করে রেখেছিস কি না?

তার মুখ থেকে তখন কোনো জবাব আসেনি শুধু এক পলক দৃষ্টি ছাড়া। সে দৃষ্টি, সে চাহনির ব্যাখ্যা করতে পারিনি। তার চোখের জটিল চাহনির সূত্র বের করতে পারিনি। তাই তো অংক মেলাতে পারিনি। জীবনে হায়ার ম্যাথমেটিকসে আমি প্রথমেই শূন্য পেলাম।

তার বিয়ে হচ্ছে। তার বিয়েতে ছবি তোলার দায়িত্ব আমার ওপরই পড়েছে। তুললাম। মনের মাধুরী দিয়ে আমার ক্যামেরার বাটনে একটার পর একটা টিপ দিয়ে অনেক ছবিই তুললাম। সে ছবির ভিড়ে আমার মনের মধ্যে একটা ছবি খুজে পেলাম। এবং সেখানে কোনো এক মানবীর চেহারা খুজে পেলাম। কিন্তু সে মানবীর পাশে আমি কাকে দেখতে পাচ্ছি? সেতো অন্য কেউ। অন্য একজন তাহলে কি সেখানে আমার থাকার কথা ছিল? মনে পড়ে, সেদিন যখন তাকে বিদায় দিচ্ছিলাম তখন সকলেই কাদছে, সকলের চোখেই পানি। আমার দুটো চোখকে সিক্ত অনুভব করলাম। তাই পরিস্থিতি সামলে নেয়ার জন্য কৌতুকের ছলে বললাম, দেখি কার কার চোখে পানি।

তখন তার এক বান্ধবী বললো, আপনি অনেক দুষ্টু।

আমি এর জবাব দিতে পারলাম না। কারণ তখন আমার কণ্ঠ ভারী হয়ে আসছিল। পালকির বেয়ারাগুলো তাকে নিয়ে ছুটছে। তাদের হই হই বল *হইয়া* শব্দের নিচে চাপা পড়ে গেল আমার বুকফাটা নিঃশ্বাস।

নাম ঠিকানা বিহীন

ডাকাতের বৌ

– মোহাম্মদ এসকে লিমন

কথায় আছে ডাকাতের বৌ নাকি সবার বৌ। কিন্তু আমি এটা বিশ্বাস করতাম না। অথচ একদিন কথাটি আমাকে বিশ্বাস করতেই হলো। সে ঘটনাই জানাচ্ছি।

আমাদের বাড়ির কাছেই হাবুডাকাতের বাড়ি। হাবু এখন শুধু ডাকাত নয়, ডাকাত সর্দার। তার প্রকৃত নাম হাবিবউদ্দিন। যেহেতু সে কোনো সম্মানজনক পেশায় জড়িত নয়, তাই গ্রামের অন্যান্য সাধারণ নামের মতো তার নামও বদলে হয়ে গেল হাবু। সর্দার হওয়ার পর এখন অবশ্য সামনে পেলে অনেকেই হাবিব সর্দার বলেই ডাকে।

এই হাবুডাকাতকে আমরা ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি একজন হাসিখুশি মানুষ হিসেবে। ছোটদের খুবই আদর করেন। গ্রামের কারো সঙ্গেই কখনো কোনো খারাপ ব্যবহার করেছে বলে শোনা যায়নি। অত্যন্ত ভালো ব্যবহার আর চমৎকার কথাবার্তায় মানুষকে মুগ্ধ করে রাখতো। লম্বা, ফর্শা, স্মার্ট আর সদা প্রাণচঞ্চল চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই এমন একটা ভয়ংকর পেশায় জড়িত আছে।

তখন সবেমাত্র কলেজে ভর্তি হয়েছি। একদিন সকালে শুনলাম কাল হাবুডাকাত কোথা থেকে যেন আমাদের বয়সী এক মেয়ে ধরে এনেছে। গেলাম দেখতে, ওমা! এতো সুন্দর মেয়ে হাবুডাকাত পেল কোথায়? আমাদের গ্রামে তো এতো সুন্দর মেয়ে দেখিনি!

নতুন জায়গা, তাছাড়া ভয়ে মেয়েটি খাটের কিনারায় জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। নাম জানলাম রিপা। হাবুডাকাত নাকি রিপার বাবা–মাসহ রিপাকে মারার জন্য এক পার্টির কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল। গতকাল রাতে সে দলবলসহ রিপাদের বাড়ি যায়। রিপার বাবা–মাকে মেরে ফেলার পর রিপাকে দেখে তার মায়া লেগে যায়। তাছাড়া যুবতী সুন্দরী একজন মেয়ে। এ জন্যই ধরে বাড়িতে নিয়ে এসেছে। যেহেতু পছন্দ হয়েছে, তাই বিয়ে করে ফেলবে। মনে মনে আমরা মেনে নিতে পারছিলাম না। এতো সুন্দর একটা মেয়ে হবে হাবুডাকাতের বৌ!

যদিও আগে হাবুডাকাতের বাড়িতে খুব একটা যেতাম না। কিন্তু রিপাকে বিয়ে করার পর প্রায়ই তাদের বাড়ি যেতাম। বিকেলবেলা সাধারণত হাবুডাকাত বাড়ি থাকতো না। বাড়িতে হাবুডাকাতের বৃদ্ধা মা আর শুধু রিপা। হাবুডাকাতকে যদিও হাবুকাকা বলে ডাকতাম তবুও রিপাকে নাম ধরে ডাকতাম। রিপাকে সমবয়সী বলেই নাম ধরে ডাকতাম। অবশ্য রিপাও আমাকে নাম ধরেই

ডাকাতো। রিপা তার অনেক কথাই আমাকে বলতো। এও বলতো, গ্রামের অন্য কেউ নাকি আমার মতো এভাবে তাদের খোজ নেয় না।

বিয়ের মাস ছয়েক পর এক খুনের মামলায় হাবু ডাকাতকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। সেই থেকে হাবু ডাকাতের বাড়িতে দারোগা পুলিশের যাতায়াত গেল বেড়ে। দারোগাবাবু প্রায়ই রাতে চলে আসতো হাবুডাকাতের বাড়ি। হাবুডাকাত তো তখন জেলে। নিশ্চয়ই আসতো রিপার কাছে। রিপাকে সব মেনে নিতে হতো। খুশি করতে হতো দারোগাবাবুকে। অবশ্য এসব তখনো বিশ্বাস করতাম না।

রিপাকে জিজ্ঞাসা করলে বলতো না কিছুই। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলতো, অন্য বিষয়ে কথা বলো লিমন।

এদিকে গ্রামের মেম্বার মণ্ডল সাহেবও রিপার খোজ-খবর নিতে শুরু করলেন। তিনিও মাঝে মধ্যে রাতে আসতেন। কিন্তু রিপার যে কিছুই করার নেই। তাছাড়া রিপাও তো রক্তে মাংসে গড়া একজন মানুষ। অষ্টাদশী পরিপূর্ণ যুবতী এক মেয়ে। তারও তো শারীরিক চাহিদা আছে। সে চাহিদা তো মেটাতে হবে কিছুটা হলেও।

খুনের মামলায় হাবুডাকাতের পাচ বছরের জেল হলো, দুই সঙ্গীর যাবজ্জীবন। এদিকে হাবুডাকাতের বাড়ির খরচের জন্য মণ্ডলসাব মাসিক কিছু টাকার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু সে টাকায় যে সংসার চলে না!

রিপা একদিন আমাকে সংসারের আর্থিক সমস্যার কথা বললো। কিন্তু আমি যে ছাত্র, কি করতে পারি? রিপার জন্য কিছু একটা করতে মন চাইলো। নতুন একটি টিউশনি ধরলাম আর এ থেকে মাসে পাচশ টাকা করে রিপাকে দিতে লাগলাম। রিপাকে টাকা দিতে কেন জানি আমার ভালোই লাগতো।

তৃতীয় মাসে যখন রিপাকে টাকা দিয়ে ফিরে আসবো তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। রিপা বললো, আর একটু বসো। তারপর ঘর থেকে বের হয়ে বাইরে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এলো। এবং দরজা লাগিয়ে খিল এটে দিল। এরপর আমার কাছে এসে হাত ধরে বললো, সবাই তো সুযোগ বুঝে আমাকে শুধু ভোগ করে। দারোগাবাবু আর মণ্ডলসাব আমাকে সংসার চালানোর জন্য সামান্য যে কয়টি টাকা দেয়, তাও শুধু আমার এ শরীরের বিনিময়ে। আর তুমি শুধু আমাকে এতোগুলো টাকা দেবে কেন? তুমিও আমাকে কাছে টেনে নাও।

সেদিন যৌবনের টানে ভদ্রতা, মানবিকতা ফেলে রিপাকে একান্ত কাছে টেনে নিয়েছিলাম, মিটিয়েছিলাম যৌবনের ক্ষিধে।

এবং সেদিন থেকেই বিশ্বাস করতে শুরু করলাম রিপা ডাকাতের বৌ আর ডাকাতের বৌ তো সবারই বৌ।

শ্রীপুর গাজীপুর থেকে

অগ্রহণযোগ্য

– কবির

কোনো এক সন্ধ্যায় আমার এক বন্ধু একটি টিউশনির অফার দিল ঢাকারই এক অভিজাত এলাকায়। তারা আজকেই টিউটরকে যেতে বলেছে। বন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ থাকায়, সে আমার হাতে হবু ছাত্রের বাসার ঠিকানা দিল। বাসায় গিয়ে ছাত্র ও তার মায়ের সঙ্গে পরিচিত হলাম। ভদ্রমহিলা খুবই সহজসরল, অকপট। সাজানো সুখের সংসার। স্বামী ডাক্তার।

তখন থেকে আমার মাস্টারি জীবনের শুরু। প্রথম টিউশনি বলে আমি ছিলাম খুবই আন্তরিক। মহিলা প্রায় প্রতিদিনই আমাকে নাশতা দিতে আসতেন। মাঝে মধ্যে আমাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে কথা হতো। আমার সঙ্গে তার সুসম্পর্কের সুযোগে তিনি আমাকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নিতেন। এতে তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়।

এক পর্যায়ে তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ি। এই দুর্বলতা প্রকট আকার ধারণ করে যখন তার মেয়েকে (ছাত্রের বড় বোন) ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির জন্যে তিনি কযেকবার ক্যাম্পাসে আসেন। তার মেয়েকে ভালো না লেগে আমার ভালো লাগলো ভদ্রমহিলাকে।

বলে রাখি, ইতিমধ্যে মহিলার সঙ্গে কয়েকবার রিকশাতে চড়ে বেড়িয়েছি। তার চুল এবং হালকা পারফিউম মাখানো নরম দেহ আমার মনকে পাগল বানিয়েছে। বুঝতে পারি, আমি ১০০% তার প্রেমে পড়েছি। ফোনে আকার-ইঙ্গিতে অনেক কথা বলেছি।

একদিন ফোনে আমার মনের অবস্থা তাকে জানাই। এতে তিনি চরম বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং আমার মাথাটা ঠিক আছে কি না জানতে চান। পরের দিন আমাকে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেন। আমি এই শর্তে দেখা করতে রাজি হই যে, তিনি আমাকে ধমক দেবেন না বা ভয় দেখাবেন না।

পরের দিন ক্লিন শেভ কর সকাল দশটার মধ্যেই তার বাসায় হাজির হই। তিনি বাসা থেকে নিউ মার্কেট যাবেন বললেন। আমি নিউ মার্কেটের রিকশা ভাড়া করেছিলাম, অথচ তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন সংসদ ভবনে। তিনি আমাকে জেরা করলেন। আমি সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিনি।

এরপরের ঘটনা খুবই জটিল। কাজে-অকাজে তার বাসায় ফোন করতাম। তিনি রাখতে চাইলেও রাখতে দিতাম না।

এক পর্যায়ে তিনিও ১০০% প্রেমে পড়েন। প্রত্যেক ঈদে তিনি আমাকে বিভিন্ন উপহার দিতেন। কেনাকাটার কথা বলে আমাকে রিকশায় নিয়ে ঘুরতেন। আমাকে বলতেন, কবির, তুমি আমার সব কিছু উল্টাপাল্টা করে দিয়েছো, আমাকে কেউ কখনো টলাতে পারেনি। তুমি আমাকে কি করলে? আমি মরে যাবো। তুমি আমাকে দশ বারো বছর পেছনে নিয়ে চলো। আমি নতুন জীবন চাই।

আমার তখন বৈরাগির অবস্থা। তার এসব কথা শুনে আমার ঘুম হারাম হয়ে যায়। কিছুই ভালো লাগে না।

কিন্তু বাস্তবতার কাছে আমরা দুজনই পরাজিত। তিনিই আমার প্রথম ভালোবাসা, তিনিই আমার শেষ ভালোবাসা। তাকে ভালোবাসবো আজীবন যদিও সমাজের কাছে আমাদের এই অসম ভালোবাসা অগ্রহণযোগ্য।

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

রহস্যের আরাধনা

– রোদ্দুর

তার সঙ্গে প্রথম দেখা ১৯ জুলাই ১৯৯৫ সালের সকাল প্রায় দশটায়। প্রথম দর্শনে আমার সত্তায় তার গোপন প্রবেশ। গোপন অনুভূতি জাগ্রত হলো। দুর দুর হৃদয় কম্পন, ভয় আর নানান কল্পনা নিয়ে দেখা হলো। নির্জনে দুজনের মাঝে যতো দূরত্ব কমতে থাকলো, হৃদস্পন্দন ততো বাড়তে থাকলো। দুই একটি কথার পর সে বাম হাতে আমার ডান হাত স্পর্শ করলো ঘড়ি দেখার উদ্দেশ্যে। তাৎক্ষণিক স্পর্শে হৃদয়ে আবেগের জন্ম নিল। অতি আবেগে জড়িয়ে ধরলাম তাকে, আবেগী স্পর্শ ভালোবাসার অনুভূতিতে পরিবর্তিত হলো। আমার শরীর তার ঠোটের স্পর্শে রোমাঞ্চিত হলো সেই প্রথম। যদিও তখনো আমার ঠোটে তার ঠোটের স্পর্শ পাইনি। দিনবদলের সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতি ছড়িয়ে পড়তে থাকলো মন থেকে সমস্ত শরীরে। প্রেম পিপাসায় তার আবেদনে সাড়া দিতে থাকলো ঠোট, বুক থেকে অস্থির শরীর।

প্রেমের বয়স যখন দুই থেকে আড়াই বছর প্রায় এমন সময় হঠাৎ এক শীতের রাতে দেখা হলো। বিশেষ সহযোগিতায় তার রুমে গেলাম। শীতের কম্পন হতে রক্ষা পেতে তার লেপে ঢুকলাম। তীব্র বাহু বেষ্টনী ও অস্থির উন্মাদনায় তার উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়লো আমার শরীরে। এ অবস্থায় আমার কানে সে শোনালো তার মিলনের ডাক।

অচেনা এক ভয়ে তাকে ফিরিয়ে দিলাম। কারণ আমি জানতাম না শরীরের ধাধায় কিভাবে মিলনের সমাধান মেলে, হয়তো অপ্রাপ্ত বয়সের অজ্ঞতা এর প্রধান অন্তরায় ছিল। ভাবতে থাকলাম মিলনের রহস্য কোথায়? কিনারা না পেয়ে একদিন তাকে আমন্ত্রণ জানালাম, সংকল্পবদ্ধ হলাম আদিম রহস্যে তার সঙ্গী হবো।

সে এলো, চোখে তৃষ্ণা জাগলো, স্পর্শে শিহরিত করলো, তার শরীরের সমস্ত উত্তেজনা আমার শরীরে ছড়িয়ে দিল, সঙ্গে জানালো একাত্মতার আবেদন। অনুমতি পেয়ে বিছানায় নিয়ে গেল, অতি আদরে বস্ত্রহরণ শেষে একে একে চোখে চোখে, ঠোটে–ঠোটে, শরীরে এবং অঙ্গে অঙ্গে কথা বলতে বলতে মিলনের স্বাদ নিতে শুরু করলো। আর আমি কুমারিত্ব বিসর্জনের প্রথম এবং শেষ কষ্টের অভিজ্ঞতা অনুভব করতে থাকলাম। দুটি দেহের এক হওয়াতে তার প্রেয়সী এই আমি কুমারী থেকে নারীতে রূপ নিলাম, জানলাম মিলনের রহস্য।

সেই থেকে শুরু। আজ প্রায় পাচ বছর হতে চললো আমরা একে অপরের মিলন সঙ্গী। বহু বহুবার দুজনে সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছি যার প্রতিটি ধাপে পান করেছি আনন্দের অমৃত সুধা। আর প্রতিবারেই তার মাঝে নতুনত্বের সন্ধান পেয়েছি যা আমাদের প্রেমের ভিত্তি দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করেছে।

পারিবারিক অবস্থা ভালো থাকার পরও আমরা বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারিনি শুধু লেখাপড়া শেষ করে স্বাবলম্বী হবো বলে। প্রায় আট বছরের প্রেমে নানান ঘাত-প্রতিঘাত এসেছে যার বেশির ভাগই পারিবারিক এবং অন্য প্রেম-উৎসাহীদের কারণে। কিন্তু কেউই আমাদের পথে বাধা হতে পারেনি। আমার দৃঢ়তা ছাড়াও এই সাফল্য শুধু সেই ব্যক্তির যে আমার নারী জীবনের পূর্ণতায়, কামনায় মহাপুরুষ, যার দৃষ্টিতে নিজের অবয়ব খুজে পাই।

সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার, এ যুগে ওর মতো এমন একজন সৎ জীবনসঙ্গী পাওয়া। বন্ধন ছাড়া সম্পর্কে সে শুধু আমাকে ভালোবাসা আর অম্লান আনন্দ খুজে বেড়ায়। সে উচ্চতায় লম্বা, চেহারায় সুপুরুষ, বর্ণে শ্যামা আর গঠনে মানানসই। অনেকেরই স্বপ্নে তার বসবাস।

আর আমি? চেহারায় দৃষ্টি কাড়া না হলেও ফিরে তাকানোর মতো। বর্ণে উজ্জ্বল শ্যামা, স্বাস্থ্যে উন্নত আর প্রধান আকর্ষণ এ যুগের মেয়েদের তুলনায় একটু লম্বা। এই যা। নিজের চাহিদা বুঝতে পারি লোভনীয় বিয়ের প্রস্তাব দেখে। কিন্তু এগুলোতে আমার ইচ্ছা বা প্রয়াস কোনোটাই নেই যেমন সে শত প্রলোভনেও নিশ্চল থাকে। মন প্রচণ্ড ভালো লাগায় ভরে ওঠে যখন অচেনা ব্যক্তিও আমাদের জুটিকে প্রশংসা করে। আমি ভাবি, হৃদয় সিংহাসনে যার আসন চিরকাল, তারই স্পর্শে পূর্ণতা পাক আমার রহস্যের আরাধনা।

বিধাতার কাছে প্রার্থনা করি সে যেন সকল সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে আমাদের দৃঢ় রাখেন। আমার নারী জীবনের সেই যেন হয় একমাত্র পুরুষ। তাকে জানাই অফুরন্ত ভালোবাসা, আমি তোমাকে ভালোবাসি আমার মন-প্রাণ, চিন্তা-চেতনা ও সর্বস্ব দিয়ে।

পাঠক-পাঠিকাদের বলি, দুজন দুজনকে বুঝতে শিখুন, ভালোবাসুন একে অপরকে হৃদয় উজাড় করে। প্রিয়জনের ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমা করুন, আদর ভালোবাসার শোধরান তাদের খারাপ ও দৃষ্টিকটু অভ্যাসগুলো, ভুলেও পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা হারাবেন না। কারণ Love is a sacrificing relationship between a man and a woman. এবং রহস্যের আড়ালে লুকানো যৌবনের যষ্টিমধু পান করুন, তবে তা যেন হয় সংকল্পের আরাধনা।

বগুড়া থেকে

নিয়তি

– ইয়াসমিন মুহ্সীন

রওশন। নামে যেমন সে রওশন, চেহারায়ও তেমনি রওশন। কিন্তু ভাগ্য তার রওশন হয়নি।

আজ থেকে বিশ বছর আগে রওশনের বিয়ে ঠিক হয় তার বাবার মতোই অবস্থাসম্পন্ন সচ্ছল এক পরিবারের বড় ছেলে, বিএসসি পাস সেলিমের সঙ্গে। বিএসসি পাস ছেলেকে নিয়ে যেমন তার বাবার

গর্বের অন্ত ছিল না তেমনি মায়ের গর্বও ছিল লাগামহীন যাকে গর্ব না বলে অহংকার বলাই উচিত। স্বাস্থ্য, উচ্চতা, গায়ের রঙ, চেহারা, পড়াশোনায় তখনকার আমলে সেলিমের জুড়ি মেলা ছিল ভার। অন্যদিকে রওশনেরও যাকে বলে *দুধে আলতা* গায়ের রঙ। দীর্ঘ কোমল ঢেউ খেলানো কালো চুল, খাড়া নাক, ডাগর চোখ আর একটু মোটা ধাচের শারীরিক গড়ন, এক কথায় অসম্ভব সুন্দরী। শারীরিক গড়নের কারণে ষোল বছরের রওশনকে বয়সের তুলনায় একটু বেশিই বড় মনে হতো। অবশ্য এ জন্য রওশনকে চরম মূল্যও দিতে হয়েছে।

সদ্যবিবাহিতা রওশনও আর দশটা বাঙালি বধূর মতোই চোখে স্বপ্নাঞ্জন মেখে একটা ছোট সুন্দর, সুখী সংসার গড়ার প্রত্যাশা বুকে নিয়ে নিজের সকল ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে স্বামীর সবটুকু ভালোবাসার পাবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যায় শ্বশুরবাড়িতে। কিন্তু রওশন প্রথম দর্শনেই তার সৌন্দর্যের কারণে অনেক প্রতিবেশীর ইর্ষার কারণ হয়ে দাড়ায়। নতুন বৌ দেখতে এসে মন্তব্যে অতি উৎসাহী কয়েকজন বলেই ফেলে, বৌ-এর বয়স সেলিমের থেকে বেশি। এ কথা শুনে সেলিমের মায়ের দর্পে আঘাত লাগে। কিছুক্ষণ আগেও যে ছেলের বৌয়ের রূপের প্রশংসায় ছিল পঞ্চমুখ, নিমেষেই সেই বৌ হয়ে ওঠে তার চক্ষুশূল।

গ্রামের প্রথা অনুযায়ী রওশন প্রথমবার শ্বশুরবাড়িতে সাত দিন ছিল। কিন্তু এই সাত দিনে সেলিমের মা রওশনকে একবারও সেলিমের কাছে যাওয়া তো দূরের কথা, সামান্য দেখা পর্যন্ত করতে দেননি। রাতে নতুন বৌকে ছেলের কাছে থাকতে না দিয়ে নিজের কাছে শুইয়েছেন। সাত দিন পর রওশন এক অব্যক্ত বেদনা নিয়ে ফিরে আসে বাবার বাড়িতে। ধীরে ধীরে সব কথা জানতে পেরে রওশনের প্রবল আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন বাবাও। সিদ্ধান্ত নেন মেয়েকে আর শ্বশুরবাড়ি পাঠাবেন না, বরং আরো ভালো ঘর, ভালো বংশের ছেলেকে দিয়ে রওশনের বিয়ে দেবেন। বাবার এমন কঠোর সিদ্ধান্তের কোনো রকম প্রতিবাদ করার ক্ষমতা ছিল না রওশনের। শুধু দিন রাতের বোবা কান্নাই ছিল তার একমাত্র সঙ্গী।

রওশনের বাবার এমন সিদ্ধান্তের কথা জানাজানি হয় তার শ্বশুরবাড়িতেও। তারাও ছোট হবে না। সেলিমকে বলে রওশনকে তালাক দেয়ার জন্য। কিন্তু সেলিম রাজি হয় না কিছুতেই। সেলিমের মায়ের একক সিদ্ধান্তেই সেলিমের নকল সাইনের তালাকনামা পৌছে যায় রওশনের কাছে। একজন ব্যক্তির শুধু একটি ভুল সিদ্ধান্তের জন্য দুই দুটি প্রাণের সারা জীবনের চাওয়া-পাওয়ার হিসাব ওলোট-পালট হয়ে যায়।

মায়ের এমন সিদ্ধান্তে সেলিম বাকরুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বাবা মায়ের ভুল সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করার মতো, সত্যকে আকড়ে ধরার মতো, পৌরুষ সে পরিস্থিতিতে সেলিমের ছিল না।

সেলিমের মা তার আপন ভাগ্নির সঙ্গে আবারও ধুমধাম করে সেলিমের বিয়ে দেন। রাগ, অভিমানে সেলিম মায়ের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে থাকতে হবে বলে বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে আশ্রয় নেয় এক বন্ধুর বাড়িতে। কিছুদিন পর একটি চাকরি পেয়ে চলে যায় অন্য জেলায় আর গোপনে রওশনের খবরাখবর নিতে থাকে।

এসব জানতে পেরে একদিন সেলিমের বাবা আসেন সেলিমের খোজে। ছেলেকে অনেক অনুরোধেও ফেরাতে না পেরে অবশেষে হাতজোড় করে পুত্রের কাছে মিনতি করেন তিনি বেচে থাকতে যেন

রওশনকে সেলিম আবার গ্রহণ করে তাকে অপমানিত না করে। যদি একান্তই কিছু করার ইচ্ছা থাকে তাহলে যেন তার মৃত্যুর পরে করে।

অন্যদিকে রওশনেরও বিয়ে দেয়া হয় বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ম্যাট্রিক পাস বাবা মায়ের অতি আদরের একমাত্র পুত্রের সঙ্গে। রওশনের শ্বশুর চলাফেরা করেন প্রচণ্ড দাপটের সঙ্গে। কয়েকশ বিঘা সম্পত্তির মালিক তিনি বুদ্ধি বলে আর কাউকে তার সমকক্ষ মনে করতেন না। কারো সঙ্গে কোনো বিবাদ হলেই হেনস্তা করার জন্য তার বিরুদ্ধে একটা মামলা ঠুকে দেয়াটা ছিল তার স্বভাব। থানা পুলিশ তার নখদর্পণে বিধায় তার বিরুদ্ধে কেউ টু–শব্দটাও করার সাহস পেতো না।

তার আদরের ছেলে বন্ধু–বান্ধব নিয়ে আড্ডা, সিনেমা দেখে টাকা ওড়াতে থাকে দুই হাতে। বাধা নিষেধের কেউ ছিল না বলে আস্তে আস্তে টাকা ওড়ানোর পরিধিটাও বাড়তে থাকে। মদ, জুয়া ইত্যাদিতে ক্রমেই তার আসক্তিও বেড়ে চলে। সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি তার যেমন ছিল না বিন্দু পরিমাণ ভালোবাসা তেমনি ছিল না একরত্তি পরিমাণ দায়িত্ববোধও। অতি আদরের দুলাল বিধায় রওশনের স্বামী কায়িক পরিশ্রমে ছিল অপরাগ এবং পড়াশোনার যা দৌড় তাতে একটা চাকরি জোটানোও ছিল তার পক্ষে অসম্ভব।

অবশ্য রওশনের শ্বশুরও ছেলেকে রোজগারে স্বাবলম্বী করার তাগিদ অনুভব করেননি কখনোই। বরং তার ধারণা ছিল, অতো সম্পত্তি যখন রয়েছে তখন চাকরি দিয়ে কি হবে! চাকরি–বাকরি গরিবের জন্য। কিন্তু কথায় আছে, *বসে খেলে সাত রাজার ধনও ফুরায়।* এবং রওশনের মামলাবাজ শ্বশুরও মামলা–হামলার তোপে পড়ে একে একে হারাতে থাকে তার জমি–জমা, সব সম্পত্তি।

বর্তমানে রওশনের দুটো মেয়ে, একটি ছেলে। বড় মেয়ে রুনু পড়ছে কলেজে। এ বছর এইচএসসি পরীক্ষা দেবে। ছোট মেয়ে রুনী পড়ছে ক্লাস নাইনে এবং ছেলেটি পড়ছে ক্লাস টু–তে। বছর তিনেক হলো রওশন সন্তানসহ এসে ওঠে বাবা, ভাই–এর সংসারে। দুই মাস আগে রওশনের শ্বশুরও মারা গেছে। শুধু ভিটে–বাড়িটুকু রেখে চরম দীনতা–হীনতায়। মৃত্যুর আগে তাকে উদরস্থ করতে হয়েছে অন্যের অনুগ্রহের অন্ন। বর্তমানে স্মৃতির স্মারক স্তম্ভস্বরূপ ভিটেটুকুর ওপর দাড়িয়ে থাকা আসবাবপত্রহীন একটি মাত্র ঘরে তাকে কাটাতে হয়েছে মৃত্যু পূর্ববর্তী দিনগুলো নিতান্তই ভিখারির মতো নিঃস্ব, নিঃসঙ্গভাবে।

এখন রওশনের স্বামী কোথায় কোথায় ঘোরে, রাত কাটায় তার কোনো ঠিক–ঠিকানা নেই। একটা মানুষের কতোদূর অধঃপাতে যাওয়া সম্ভব, রওশনের স্বামী তার জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ। কিছুদিন আগে রওশনের স্বামী তার বড় মেয়ে রুনুর অসুস্থতার চিকিৎসার নামে মিথ্যা কথা বলে অনেক লোকজনের কাছ থেকে ধার নিয়ে, সাহায্য নিয়ে কোথায় চলে গেছে। কতোটা বোধশূন্য মনুষ্যত্বহীন হলে মানুষ নিজের মেয়েকে নিয়ে এমন জঘন্য মিথ্যা কথা বলতে পারে ভাবলে অবাক লাগে।

এদিকে সেলিমের বাবাও মারা গেছে, আজ প্রায় বছর দুয়েক পেরিয়ে এলো। সেলিম তারপর থেকেই রওশনের খোজখবর নিতে শুরু করে চূড়ান্তভাবে। কিছুদিন হলো সে ট্রান্সফার হয়ে রওশনের বাড়ির পাশেই চলে এসেছে। দিনের পর দিন সে রওশনের মেয়েদের স্কুল কলেজের পথে দাড়িয়ে তাদের দিক তাকিয়ে থাকে যতোক্ষণ না তারা দৃষ্টিসীমার আড়াল হয়। কিন্তু কোনো কথা বলে না। একদিন বিরক্ত হয়ে রুনু তাকে জিজ্ঞাসা করে, কেন বাবার বয়সী হয়েও সে এমন আচরণ করছে।

সেলিম অনেক অনুনয়-বিনয় করে কিছু কথা বলার জন্য রুনুকে তার বোনের বাসায় নিয়ে যায়। কলেজের পাশেই সেলিমের বোনের বাসা। সেলিম সেখানে রুনুকে সব কথা খুলে বলে অশ্রুসিক্ত নয়নে। এও বলে যে, রুনুর মধ্যে দিয়ে সে রওশনকে দেখতে পায়। রুনু অবিকল তার মায়ের মতোই দেখতে।

বেশ কিছুদিন থেকেই সেলিম অনেকের মাধ্যমে রওশনকে তার বাবা, ভাইদেরকে জানিয়ে যাচ্ছে যে, সে রওশনকে ফিরিয়ে নিতে চায় পুনরায় বিয়ে করে। রওশনের সন্তানদের দায়িত্ব সে পালন করবে আপন পিতার মতোই। রওশনের বাবা-মা, ভাইয়েরা সব কিছু রওশনের সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। রুনু, রুনীও চায় তাদের মাকে সুখী দেখতে।

কিন্তু রওশন রাজি নয় সেলিমকে আবার বিয়ে করতে। কারণ সেলিমের ভাষ্য মতে, রুনুর জন্মের খবর শোনার পর থেকে সেলিম তার দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে বসবাস শুরু করেছে তার আগে নয়। বর্তমানে দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে সেলিমের দুটি সন্তানও রয়েছে। রওশন তার ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে। তার জীর্ণ-ক্লিষ্ট জীবন, ভগ্ন হৃদয় নিয়ে সে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চায়। কিন্তু নিজের সুখের জন্য আরেকজনকে সে অসুখী করতে চায় না। জীবনের এই চরম সত্যকে রওশন নিয়তিরূপেই মেনে নিয়েছে।

ঘর ভাঙার বেদনা কতোখানি, স্বামীর ভালোবাসা না পাওয়ার যন্ত্রণা কতোখানি তা রওশনের মতো আর কয়জন বোঝে! এ জন্যই হয়তো রওশন চায় না সেলিমের দ্বিতীয় স্ত্রীও তার মতোই বঞ্চিত হোক।

মানুষের জীবনটা কতো সুন্দর, অথচ কতো ক্ষণিকের - এই বোধটা যদি সকলের থাকতো তাহলে পৃথিবীটা হয়তো আরো অনেক সুন্দর হতে পারতো। আরো কতো সেলিম, কতো রওশনের জীবন সুখে পরিপূর্ণ হতো।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

উপেক্ষিত

- সুফিয়া জামান

আমি এই সুন্দর পৃথিবীতে একজনকে ভালোবাসি। কিন্তু সে জানে না তাকে আমি ভালোবাসি। তাকে জানতে না দেয়ার অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি হলো, তার যোগ্য নই আমি। এছাড়াও তার ঘরে আছে সুন্দরী স্ত্রী আর ফুটফুটে ছেলেমেয়ে।

বিচিত্র মানুষের এই মন। যাকে কোনোদিন পাওয়ার সম্ভাবনা নেই তাকেই দীর্ঘ প্রায় ষোল বছর যাবৎ হৃদয়ে লালন করে আসছি। প্রতিদিন তাকে একপলকে দেখা চাই-ই। যেদিন দেখতে না পাই সেদিনটি আমার খুব কষ্টে কাটে। যখন সবদিক থেকে কষ্টগুলো আমার দিকে ধেয়ে আসে তখনই আমার আকাঙ্ক্ষিত এ স্বপ্ন পুরুষটিকে দেখতে ইচ্ছে করে। আর দেখতে পেলেই মনটা শান্তিতে ভরে যায়।

তার একটু ছোয়া, একটু সোহাগ পেতে বড় ইচ্ছে করে। সমুদ্র সৈকতে অস্তমিত সূর্যের দৃশ্যে অভিভূত হয়ে সেই মায়াবী পরিবেশে তার হাতে হাত, চোখে চোখ রেখে ভালোবাসার কথা বোঝাতে যে বড্ড ইচ্ছে করে।

অতি সাধারণ আর রুচিশীল পোশাকে সজ্জিত অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব আর অপরূপ পৌরুষে ভরা সে। তার প্রতিটি পদক্ষেপেও দৃঢ়তা, বিশ্বাস ও ব্যক্তিত্বে ভরা। অতি চমৎকার এ পুরুষটিকে দেখলেই এক পলকে আমার মনটা দুর্দান্ত ভালোলাগায় ভরে যায়।

স্বপ্নে কখনো তার সঙ্গে বেড়াতে যাই, কখনো তার বলিষ্ঠ কবজিটি শক্ত করে ধরে দুর্গম পথ পাড়ি দিই। কখনো শরতের চন্দ্রালোকে দুজনে নদীর ধারে বসে পানিতে জ্যোৎস্নার আলোর রিমঝিম খেলা দেখি। কখনো গভীর রাতে ছাদে বসে নিস্তব্ধ প্রকৃতি উপভোগ করি। কখনো তাকে নিয়ে গল্প লিখি। কখনো বা তার প্রিয় আইটেমগুলো নিজ হাতে রান্না করে সামনে বসে তৃপ্তি ভরে তার খাওয়ার দৃশ্যটা উপভোগ করি। কখনো সুন্দর শাড়িতে নিজেকে সাজিয়ে তার সামনে উপস্থাপন করি। কখনো বা আজন্ম লালিত সাধের টিকলি পরে তার সামনে গিয়ে লজ্জা পেয়ে তারই বুকে মুখ লুকাই। কখনো তার পূজায় নিজেকে সমর্পণ করি। আবার কখনো কর্মক্লান্ত মানুষটির কপালে ঘাম বড় মমতায় আচলে মুছে দিই। কখনো তার চওড়া বুকটিতে মাথা রেখে আমার সমস্ত ক্লান্তি ও গ্লানি দূর করি। কখনো তার কোলে মাথা রেখে শ্রাবণের বৃষ্টির ঝমঝম আওয়াজ শোনার সময় শৈশবের স্মৃতিচারণ করতে গেলে সে আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিশফিশ করে, কবি ডান–এর ভাষায় বলে, For God's sake, hold your tongue and let me love.

অতি কাছের মানুষটিকে অতি দূরে রাখার অব্যক্ত কষ্ট অতি সংগোপনে হৃদয়ে লালন করে আসছি। তাকে ভুলতে চাই। কিন্তু পারি না। এ পাপের জন্য স্রষ্টা কি শাস্তি আমার জন্য বরাদ্দ করেছে তাও আমার জানা নেই।

আমি উপেক্ষিত অবহেলিত আর বঞ্চিত এক নারী। আরো উপক্ষো, অবহেলা এবং বঞ্চনা পেতে চাই না। তাছাড়া ভালোবাসার মানুষটিকে কাছে পেতেই হবে এমন তো কোনো কথা নেই! আমার ধারণা ভালোবাসার অর্থ বিশাল, স্নিগ্ধ, সুন্দর এক অনুভূতি। ভালোবাসা মানে স্নিগ্ধ সকাল, সবুজ মাঠ, কলতান, বৃষ্টিতে ভেজা, না বলা কিছু, অনুভূতি, আরো অনেক কিছু। ভালোবাসা মানে কষ্ট, সততা ও সংযম।

এই সুন্দর পৃথিবীতে তাকে কাছে নাইবা পেলাম আমার সংযম আর সততার বিনিময়ে অনন্ত জীবনে। বিশ্ব প্রভুর কাছ থেকে স্থায়ীভাবে তাকে অর্জন করে নেবো। এবং তা শিগগিরই প্রাপ্তির জন্য সবার অবহেলা নিয়ে অনন্ত জীবনে শিগগিরই পাড়ি দেয়ার প্রচণ্ড ইচ্ছে আমার।

গুলশান, ঢাকা থেকে

ছায়া

– সুইট

গত কিছুদিন থেকেই ভাবছি, শুভকে নিয়ে আমার অসম্ভব ভালোলাগার কিছু স্মৃতি আছে। মনটা ভালোলাগায় পুরিপূর্ণ। মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে কি লিখবো। কোন ঘটনাটা লেখা যায়? সবটাই বড় সুন্দর। দুজনে যখন আমরা ধানমন্ডি লেকে যাই, কিভাবে যে সময় কেটে যায় তা কেউই বুঝতে পারি না। ঠিক এ রকম যখন মনের অবস্থা তখন একটা সুন্দর সকালে দৈনিক পত্রিকা নিয়ে বসি পড়বো বলে।

প্রথমেই যে সংবাদটা চোখে পড়লো তা হলো, মডেল কন্যা তিন্নি খুন! বুকটার মধ্যে ছ্যাৎ করে উঠলো। মনটা খুব খারাপ হলো। কিছুতেই আর আগের ভাবনায় যেতে পারলাম না।

তিন্নি কেমন ছিলেন অথবা তার জীবনযাত্রাই বা কেমন ছিল এটা পরের কথা। প্রথম কথা হলো এ রকম মৃত্যু আমাদের কাম্য নয়। মনের ভেতর গভীর ক্ষত নিয়ে ঘুরছি। মৃত্যুর ওপারের জীবন সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। তবে আল্লাহর কাছে তার জন্য আমি দোয়া চাই।

আজকেও ধানমন্ডির লেকে আমি আর শুভ বসেছিলাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। শুভ আমাকে লাল হলুদ গোলাপ কিনে দিল তিনটা। শুভ যখন আমাকে আদর করছিল তখন ওকে বললাম, শুভ, কোনদিন আমার মৃতদেহ আবার ধানমন্ডি লেকে পাওয়া যাবে না তো?

পুলপাড়, ঢাকা থেকে

তুমি আছো তুমি নেই

– সুফিয়ান খান

সুমিকে এই প্রথম এতোটা বিমর্ষ অবস্থায় দেখলাম। কিন্তু প্রশ্ন করে কোনো উত্তর পেলাম না। বার বার ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রশ্ন করা ঠিক হবে না ভেবে প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলা শুরু করলাম। তার মনে আমার কথা তেমন একটা প্রভাব ফেলতে পারছে না। খানিকটা দ্বিধান্বিত হলাম এ জন্য যে, সে কি কোনো কারণে আমার ওপর বিরক্ত? বললাম চলো, কোথাও বেরিয়ে আসি।

আজ নয়, অন্যদিন। বলে সে বাসায় ফিরে গেল।

একদিন, দুই দিন করে পক্ষকাল পেরিয়ে যায় সুমি আর আমার সঙ্গে যোগাযোগ করছে না। তার নীরবতার কোনো উপযুক্ত কারণ খুজে বের করতে পারলাম না। যে কি না আমার সঙ্গে একদিন যোগাযোগ না হলে অস্থির হয়ে যেতো সে এতোদিন যোগাযোগ করছে না! মোবাইলে রিং বাজতেই তার সঙ্গে কথা বলার প্রস্তুতি নিয়ে কল রিসিভ করি। কিন্তু তার কণ্ঠ শোনা যায় না। আশাহত হই। এই অদৃশ্য সমস্যার আবর্তে আমার জীবন ঘূর্ণিপাক খাচ্ছে, অসহায় থেকে অসহায়তর হয়ে যাচ্ছি।

আজ খুব ভোরে ঘুম ভাঙলো। বিছানা ছেড়ে এখনো উঠিনি। পত্রিকার পাতায় চোখ বোলাতে বোলাতে ভাবলাম আজ তার বাসায় রিং করে কথা বলবোই। ব্রেকফাস্ট সেরে বাইরে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছি এ সময় মোবাইলে রিং বাজতে শুরু করলো। ওপ্রান্ত থেকে খুব তাড়াহুড়ো করে সুমি বলতে

লাগলো, বাসা থেকে রিং করছি। তাই বেশি কথা বলতে পারবো না তোমার কাছে। টাকা পয়সা যা আছে তা নিয়ে বাসা থেকে বের হও। বলেই লাইন কেটে দিল।

আমি এক অজানা আনন্দ এবং শংকার মধ্য দিয়ে বাসা থেকে বের হলাম। দুইটা বেজে যাচ্ছে। কিন্তু তার আসার কোনো খবর নেই। অস্থির সময় কাটতে লাগলো। সিগারেট খেয়ে সময় কাটাতে থাকলাম। তিনটা পনেরো মিনিটে আমার অপেক্ষার যবনিকা ঘটিয়ে সে এসে পৌছালো। কতোদিন পরে তাকে দেখলাম মনে মনে সে হিসাব করার চেষ্টা করলাম। শেষ বিদায়ের দিন তাকে যেমন বিমর্ষ দেখেছি আজও তাকে সে রকমই মনে হলো।

উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে সে বলতে শুরু করলো, আমি বাসা থেকে পালিয়ে এসেছি। তুমি যে করেই হোক আমাদের থাকার ব্যবস্থা করবে। এখন আর আমার বাসায় ফেরার পথ নেই।

তার কথা শুনে কি বলা উচিত বুঝতে পারলাম না। বললাম, তুমি আগে শান্ত হও। তুমি যা বলো সবই করতে পারবো। তার আগে সমস্যাটা কি সেটা তো শুনতে হবে।

কান্নাজড়িত কণ্ঠে সে বলতে লাগলো, আম্মা আর বড় ভাইয়া মিলে আমার বিয়ে দেয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। ছেলে কলেজে শিক্ষকতা করে। আমি নানানভাবে তোমার পক্ষ নিয়ে বোঝাতে চেয়েছি। কিন্তু তারা কিছুতেই আমার কথায় রাজি হচ্ছে না। সামনের সপ্তাহে ছেলের গার্ডিয়ান আমাকে দেখতে আসবে। আম্মা আর ভাইয়া চাচ্ছে সে সময় বিয়ের কাজটাও সেরে ফেলতে।

বললাম, এতোদিন তুমি এসব ব্যাপারে আমাকে জানাওনি কেন?

সে কথা পরে হবে। এখন কোথায় যাবো, কি করবো আগে সেটা ঠিক করো।

পকেটের অ্যামাউন্টটা মনে মনে ঠিক করে নিলাম। দুইশ বিশ ডলার আর দুই হাজার চারশ ত্রিশ টাকা। বললাম, আমি এখনো লাঞ্চ করিনি। চলো আগে কিছু খেয়ে নিই, তারপর ভেবেচিন্তে যা করার করবো।

পাচটা বেজে গেছে। সুতরাং কোর্টে গিয়ে এখন আর লাভ নেই। ধারে কাছে কোথায় কাজি অফিস আছে মনে মনে তা খুজতে লাগলাম। আমার বাসার কাছে যে কাজি অফিস সেখানে ছাড়া ঢাকা শহরের কোনো কাজি অফিসের কথা এ মুহূর্তে মনে আসছে না।

সে খুবই অভিমানী কণ্ঠে বললো, আমার মনে হয় আমি আসাতে তুমি খুশি হতে পারোনি।

তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। আমরা দুইজনই প্রাপ্ত বয়স্ক। সুতরাং যা করবো ভেবেচিন্তেই করবো।

বাসায় ফোন করে জানিয়ে দিলাম, আমি আজ ফিরছি না। সমস্যা হলো তাকে নিয়ে রাত যাপন। ইচ্ছা করলে মাকে কনভিন্স করতে পারি। কিন্তু সুমি সেটা এ মুহূর্তে সহজভাবে নিচ্ছে না। খানিকটা শংকা ও সীমাহীন আনন্দ হচ্ছে এ জন্য যে, যাকে নিজ জীবনের মতো ভালোবাসি সে আমারই টানে আজ সব তুচ্ছ করে আমার কাছে ছুটে এসেছে। তার সামান্যতম অবহেলা যাতে না হয় সেদিকে যথাসম্ভব দৃষ্টি রাখলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম, আজকের রাতটা যাক, আগামীকাল যা করার করবো।

জীবনে এই প্রথম হোটেলে রাত কাটাচ্ছি। নতুন এ পরিবেশটা ভালো লাগছে, না খারাপ লাগছে সেদিকে খেয়াল করার অবকাশ নেই। এখন রাত একটা। আমাদের অনাগত দিন নিয়ে সুমি তার পরিকল্পনা বলে যাচ্ছে।

তাকে বললাম, তোমার মা আর ভাই আমার ওপর এতো ক্ষেপা কেন?

সে প্রশ্ন এড়িয়ে গেল।

ভোর হতে এখনো অনেক বাকি। আগামীকালের কাজগুলোর একটা ছক তৈরি করতে লাগলাম। সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফারুকের নাম্বারে রিং করলাম। বিস্তারিত না বলে সকালে আসার কথা বললাম। প্রয়োজনীয় আরো কয়েকটা নাম্বারে যোগাযোগ করছি। সুমি হাত মুখ ধুয়ে এসে আমার পাশে বসলো।

তার ঠোঁটে চুমু দিয়ে বললাম, তুমি সত্যিই সাহসী।

আমাদের বিয়ের দ্বিতীয় দিন। সুমিকে বললাম, তুমি বাসায় একটা রিং করে কথা বলো।

সে তেমন একটা আগ্রহ দেখালো না।

জিজ্ঞাসা করলাম, যে ছেলেটির ব্যাপারে বলেছো সে কি তোমার পূর্ব পরিচিত?

সে নীরব থাকলো।

সকাল প্রায় দশটা বেজে গেছে। মা ব্রেকফাস্টের জন্য ডাক দিতেই মায়ের কাছে ছুটে গেলাম। আমার ওপর মা অভিমান করে আছে কি না বুঝতে পারছি না। আমি সমস্যার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সুমিকে নিয়ে বাসায় ওঠার কথা মা বলেন। অযথা সমস্যা এড়ানোর এটাই ছিল সহজ পথ। ব্রেকফাস্ট সেরে বাইরে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছি এ সময় কলিংবেল বেজে উঠলো। দরজা খুলে পুলিশ দেখেই কারোরই আর বুঝতে বাকি রইলো না পুলিশের উপস্থিতির কারণ।

সুমিকে বললাম, তোমার গার্ডিয়ান শেষ পর্যন্ত দেখছি জেলের ভাত খাওয়াবে।

সে অভয় বাণী দিয়ে বললো, কোর্টে উঠতে যতোক্ষণ, এর বেশি নয়।

আজ মামলার রায়। কিন্তু টেনশন করার মতো কোনো কারণ নেই। একটু পরেই সুমির হাতে হাত রেখে আমরা আবারও আমাদের পৃথিবীতে ফিরে যাবো।

অপহরণ মামলায় সাজা হলো। জানতে পালরাম না কেন সুমি আমার বিরুদ্ধে অবস্থান নিল। খবর নিয়ে যতোদূর জেনেছি, সে ছেলেটিকে নিয়ে সুমি ভালো আছে। রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে শেষ পর্যন্ত জিতেছি। কিন্তু সুমিকে আর পাইনি।

সুমি, তুমি এখনো আছো আমার জীবন জুড়ে যতো স্বপ্নে, তুমি নেই বাস্তবে আমার জীবনে, থেমে গেছে জীবনের যতো আয়োজন তোমায় বিহনে।

কাঞ্চনপুর, রামগঞ্জ থেকে

জয়নাল

– কামরুন নাহার

আমাদের কলেজের ইংরেজি টিচার মেহবুবাআপা আমাকে খুব স্নেহ করতেন। অনেক দিনই ক্লাসের অনেকটা সময় আমার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতেন। কেমন খেয়ালিপনা, দার্শনিকতা আর আত্মমগ্নতায় বিভোর থাকতেন। ইংরেজি সাহিত্য পড়াতেন চমৎকার। আপার এসব বৈশিষ্ট আমাকে ভীষণ তার কাছে টানতো।

১৯৮৭ সালের কোনো একদিনে আমাকে আপা জিজ্ঞাসা করলেন, বলো তো আমাদের জীবনটা কি খুব বড়, না ছোট?

তার উত্তরে আমি তখন বলেছিলাম, আমাদের জীবনটা অনেক বড়।

আমার উত্তর শুনে আপা বলেছিলেন, তুমি আসলেই খুব ছোট।

কিন্তু যতো বড় হচ্ছি, যতো দিন যাচ্ছে ততোই বুঝতে পারছি আমাদের এই জীবন অতি ছোট। এই কয়েকদিন, কয়েক বছর আগে আমার কতো প্রিয়জন ছিল, কেমন স্বপ্নের মতো একে একে তারা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছে। শুধু দেখছি আর ভাবছি এ জীবন অতি তুচ্ছ, অতি ক্ষুদ্র। মহাকালের একটি পলকসম। এই ক্ষুদ্র জীবনে আমরা প্রতিনিয়ত কতো কিছুর সঙ্গে কতো রকমের ভালোবাসায় যে জড়িয়ে পড়ি তার হিসেব মেলা ভার।

খুব ছেলেবেলায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছি। বাড়িটা কোথায় ছিল আমার ঠিক মনে নেই। তবে বাড়ির পাশেই একটি রেললাইন ছিল এবং সেই রেললাইনের ওপর অথবা পাশে ছোট একটি শিশুকে দেখেছিলাম যার সঙ্গে আমার বুদ্ধিমান প্রতিবন্ধী ভাইটির খুব মিল ছিল। বেড়ানো শেষে বাড়ি ফেরার সময় সেই অপরিচিত ছেলেটির জন্য বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠলো।

প্রায় দশ বারো বছর আগে আমাদের বাসায় ফুট–ফরমায়েশের কাজের জন্য জয়নাল নামের ছোট একটি ছেলেকে রাখা হলো। সে ছিল ভীষণ বুদ্ধিদীপ্ত, কৌতূহলী এবং দুরন্ত স্বভাবের। তার সব আচার–আচরণই আমার আব্বাকে বিমোহিত করলো। আব্বা তার প্রতি গভীর মায়ায় জড়িয়ে পড়লেন এবং তাকে লেখাপড়া শেখানোর মহাযজ্ঞে নামলেন। আমরা ভাইবোনরাও তাতে যোগ দিলাম।

কিন্তু দুষ্টুমিতে জয়নালের যতো মন ছিল ততোটা পড়াশোনায় ছিল না। আজ সে পা মচকে ফেলে তো কাল তার থুতনিতে সেলাই দিতে হয়। এসব আচার–আচরণে আমার মা অতিষ্ঠ হয়ে তাকে তার মায়ের কাছে বুঝিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। জয়নালও অবিচল। আমার বাবার শত অনুরোধ উপরোধকে উপেক্ষা করে অভিমান নিয়ে তার মায়ের সঙ্গে রংপুর চলে গেল। তারপর থেকে আমার আব্বার খুব মন খারাপ। আব্বা ভাবলেন তার অভিমান কমলে হয়তো চলে আসবে। সে আর এলো না।

এরপর বাসায় জয়নালের বয়সী যতো ছেলে ছিল তাদেরকে আব্বা তার নামেই ডাকতেন আর মনে মনে প্রার্থনা করতেন জয়নাল যেখানেই থাকুক সে যেন ভালো থাকে।

জয়নাল চলে যাবার সাত আট বছর পর এক যুবক এসে আমাদের বাসায় হাজির। সে নানাকে অর্থাৎ আমার আব্বাকে খুজছে। ভালো করে খেয়াল করতেই বুঝলাম এতো আমাদের সেই ছোট্ট জয়নাল। আনন্দে চিৎকার দিয়ে উঠলাম। আমার অতি ব্যস্ত আব্বা সে সময় সৌভাগ্যক্রমে বাড়িতেই ছিলেন। আব্বা তো তাকে পেয়ে মহাখুশি। ত্বরিতগতিতে তার সব খবরাখবর জানলেন এবং পরম প্রশান্তি অনুভব করলেন জয়নাল সুখে আছে জেনে।

রায়েরবাজার, ঢাকা থেকে

নাম

বেশ কিছুদিন থেকে নিজের মনের সঙ্গে এক অদৃশ্য দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছি আমি। অনেক ঝড়–ঝাপটা অতিক্রম করে এই অবস্থানে পৌছে অভিভাবকের সিদ্ধান্তকে যখন চরম বলে মনে মনে স্থির করছি, প্রেম করাকে ছেলেমানুষি মনে হয় ঠিক তখনই তার আচরণ সন্দেহজনক মনে হয়।

সে আমার বন্ধু, খুব কাছের বন্ধু। তাই তার আচরণকে সন্দেহ করিনি। যদি তাতে বন্ধুত্বের অবমাননা হয়, যদি সে আমায় ছোট মনের মনে করে। তাকে ভালোবাাসি অনেক বেশি তবে এ ভালোবাসাকে কোনো সম্পর্কের মধ্যে বন্দী করতে চাইনি। এ জন্যে সে যখন তার কষ্টের কথা বললো, মনে হলো আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে তার কষ্টকে দূর করতে চেষ্টা করবো।

জানতে চেয়ে তাকে বললাম, বলা কি যায় না তোর কষ্টের কথা আমাকে।

পূর্ণিমার চাদ হাতের মুঠোয় পেলেও যতো অবাক হতাম তার থেকে বেশি অবাক করে দিয়ে সে আমায় বললো, আমি তোকে ভালোবাসি।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় আমি, O.K ছাড়া কিছুই বলতে পারলাম না। কারণ অনেকের মতে ভালোবাসি মানে প্রেম প্রেম খেলা ছাড়া কিছুই নয় যে খেলার শেষ হয় দুঃখ দিয়ে। কিন্তু তার প্রতি আমার যে ভালোবাসা তাতে শুধু মঙ্গল কামনা আছে। আর আছে তাকে সুখসাগরে ভাসিয়ে দেয়ার ইচ্ছা। শুধু নেই ইচ্ছাকে বাস্তবায়নের সামর্থ। তাই তো আমাদের মধ্যে যখন প্রেম শব্দটার ব্যবহার হয় তখন প্রচণ্ড ভয় হয়। ভয় হয় যদি আমার কারণে তার কোনো কষ্ট হয়। আমাদের অন্য বন্ধুরা মনে করে, আমরা প্রেম করছি।

কিন্তু আমি মনে করি আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি যে ভালোবাসাতে নেই কোনো ছেলেমানুষি, পাগলামি, নোংরামি। আছে শুধু ভালোবাসা যাকে কোনো সম্পর্কের বাধনে বাধা যাবে না। বন্ধুত্বের নয়, প্রেমেরও নয়, তার থেকেও বেশি ভালোবাসা যার মধ্যে চাওয়া নেই, পাওয়া নেই, আছে শুধু ভালোবাসা। এর কি অন্য কোনো নাম দেয়া যায়?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
মুন্সিগঞ্জ থেকে

মরীচিকা

– নজরুল ইসলাম

শুনেছি, ইউনিভার্সিটি নাকি প্রেমের বিশাল বাজার। আরো শুনেছি ইউনিভার্সিটিতে যার প্রেম হবে না, প্রেমের ফুল তার জীবনে আর নাও ঘটতে পারে। তাই ইউনিভার্সিটিতে আসার আগের বসন্তগুলো পার করেছি অন্তত ইউনিভার্সিটিতে কিছু একটা করবো বলে। পার করেছি বললে ভুল হবে। বলতে হবে পার করতে হয়েছে। কেননা মোটামুটি গোছের কাউকে দেখলেও ঢোক গিলতাম। এবং বালিকার সামনে গেলে তো বেশ বড় হয়েও প্যান্টের ভেতর কেমন আদ্রতা অনুভব করতাম।

যাহোক, অবশেষে কাঙ্ক্ষিত ফার্স্ট ইয়ারে আসা হলো। ক্লাসে কয়েকদিন ধাতস্থ হয়েই উকিঝুকি মারতে শুরু করলাম। ফ্যাকাল্টিতে সবচেয়ে জুনিয়র বলে সহপাঠিনীদের নিয়েই প্রেমের প্রথম পাঠ নিতে চাইলাম। কিন্তু একি! ভর্তি হওয়ার এক দেড় মাসের মধ্যেই তাদের মুখে শুনি, সেকেন্ড ইয়ারের অমুকভাইয়ের নোট খুবই ভালো, থার্ড ইয়ারের তমুকভাইয়ের যা চেহারা!

ধরণী দ্বিধা হও। বুঝলাম, যতোক্ষণ পর্যন্ত মিনিমাম সিনিয়র না হচ্ছি ততোক্ষণ পর্যন্ত ভালোবাসার ফুল ফুটবে না। পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে চাইলাম। শেষ পর্যন্ত সেশন জটের কল্যাণে আঠারো মাসে বছর গুণে ফার্স্ট ইয়ারের বৈতরণী পার হলাম।

সেকেন্ড ইয়ারে উঠেই ফার্স্ট ইয়ারের কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে কেমন করে যেন ভাব জমিয়ে ফেললাম। শুধু ভাব নয়, রীতিমতো সময় দিতে লাগলাম। পকেটের স্বাস্থ্য খারাপ হতে হতে এমন অবস্থা হলো যে, সেকেন্ড ইয়ারের বই কেনার জন্য বাবার দেয়া টাকাগুলোও তাদের পেছনে খরচ করে পুরনো বইয়ের জন্য সিনিয়র ভাইদের কাছে ধরনা দিতে লাগলাম, তারপরও যদি কিছু একটা হয়ে যায়।

বিশেষ করে ফার্স্ট ইয়ারের শিমু মেয়েটি আমার সব কিছু গুবলেট করে দিয়েছে। কেমন মায়াকাড়া চেহারা। হাসলেই প্রীতি জিনতার মতো গালে টোল পড়ে। আমার মনে হয়, এ রকম হাসির জন্য পকেটের স্বাস্থ্য কেন, নিজের স্বাস্থ্যও খারাপ করতে পারি।

একবার ইউনিভার্সিটির এক ফাংশনে শিমু খুব সেজেগুজে এসেছিল। কপালে টিপ, চোখে মাসকারা, আরো কতো কি। বিশেষ করে শিমুর শর্ট কামিজে তাকে এতো সুন্দরী ও লম্বা লাগছিল যে, নিজেকে শিমুর শর্ট কামিজের চেয়েও শর্ট লাগছিল। তারপরও সাহস করে সেদিন তার মুখোমুখি হয়ে তাকে *রানুকা*–তে খাওয়াব বলে সময় চাইলাম।

দ্রুত এ প্রস্তাব লুফে নিয়ে শিমু তার এক দঙ্গল বান্ধবীসহ আমার ঘাড়ে চেপে বসলো। খাওয়া–দাওয়ার শেষ পর্যায়ে শিমু অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললো যে, আমাদের ডিপার্টমেন্টে সদ্য জয়েন করা টিচারটা নাকি খুবই হ্যান্ডসাম। তাকে সেদিন ক্লাসে প্রশ্ন করার ছলে মিষ্টি করে হেসেছিলেনও। রোক ক্ষার ভুপ্র অর্থাৎ ডান দিক থেকে উল্টোভাবে পড়ুন।

প্রেমের ব্যাপারে সিনিয়ররা অগ্রাধিকার পায়। তাই বলে একেবারে ফার্স্ট ইয়ার থেকে সরাসরি টিচার! তাহলে সূত্র মতে, মাস্টার্সের আপুদের ইউনিভার্সিটির ভিসি–কে নিয়ে স্বপ্ন দেখার কথা। সে স্বপ্ন ওনারা দেখেন কি না জানি না। তবে শিমুকে দেখতে দেখলাম। বন্ধুদের হাসাহাসি, টিপ্পনি সমান

তালে চলছে। মনকে বোঝালাম প্রেম করা হবে না, ইউনিভার্সিটিতেও না। মাঝখানে বেশ কিছু সময় হারিয়ে থার্ড ইয়ারে প্রমোশন পাওয়ার জন্য তড়িঘড়ি করতে লাগলাম। থার্ড ইয়ারে উঠলামও। পড়াশোনা করবো বলে স্থির করলাম। কিন্তু স্বভাব যায় না মলে।

একদিন ফার্স্ট ইয়ারের সুন্দরী এক মেয়ে যাকে আমি আগে থেকেই একটু একটু চিনতাম সে যেচে কথা বললো। আমিও সব ভুলে গিয়ে একেবারে গদগদ। আবার হৃদয়ে ঝড় উঠতে শুরু করেছে। এ সুযোগে মেয়েটিও আমার বই, নোট সব হাতিয়ে নিয়েছে। আমিও ভবিষ্যতে প্রজাপতি উড়বে বলে সব বিনা দ্বিধায় মেনে নিলাম। মাঝে মধ্যে সে বেশ সিরিয়াস ভঙ্গিতে আমার শারীরিক অবস্থা জানতে চাইতো। আমি তো ধরেই নিয়েছি এবার না হয়ে যায় না।

একদিন সে আমাকে বললো, আমরা কোথাও ঘুরে আসবো, রেডি থাকবেন। দিন, তারিখ ও স্থান সেই ঠিক করলো। এ যে মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি। যাহোক, কাঙ্ক্ষিত দিনের ফুলবাবুটি সাজার জন্য ঘষামাজা শুরু করলাম। কাচাহলুদ বেটে মুখে মেখে তারপর মুখ ধোয়া, কাচা ডিমের উৎকট গন্ধ উপেক্ষা করে ডিমের কুসুম ভেঙে মাথার চুল ধোয়াসহ আরো অনেক প্রস্তুতি। অবশেষে দিনটি সত্যি সত্যি এলো। কিন্তু এ আমরা যে সে ও আমি মিলে আমরা নই, বরং সে এবং তার ইয়ে মিলে আমরা সেটা জায়গা মতো গিয়ে বুঝলাম।

পৃথিবীকে খুব নিষ্ঠুর মনে হলো। প্রকৃতি দুর্বলদের প্রতি অবজ্ঞাই করে। তারপরও দাতে দাত চেপে তাদের সঙ্গে সৌজন্যতা রক্ষা করে চলছি। কিন্তু তাদের মাত্রাতিরিক্ত খুনসুটি দেখে আরব্য রজনীর বিশ্বাসঘাতক মেয়েটির কথা মনে পড়লো এবং নিজেকে বাদশার ভূমিকায় কল্পনা করতে লাগলাম। কথা বলার এক পর্যায়ে আমাকে একটা ধাধা বললো শিমু ।

ধাধার জবাব সেদিন দিতে পারিনি। ওরা দুজনেই হেসে লুটোপুটি। চোখ ফেটে কান্না আসতে চাইলো। বিদায় নিয়ে চলে আসার সময় ধাধা না পারার জন্য নিজেকে খুব ছোট মনে হতে লাগলো। তাই ফুটপাথ থেকে ছোটদের ধাধার একটি বই কিনে দাড়িয়েই পড়া শুরু করলাম। ভাগ্য গুণে তাদের বলা ধাধাটি প্রথম দিকেই পেয়ে গেলাম।

ধাধার উত্তর ছিল একদম সোজা।

ছাগল।

পাঠক, নিশ্চয়ই বুঝেছেন সেদিন এ ধাধা বলার উদ্দেশ্য কি ছিল!

চট্টগ্রাম থেকে

কুয়েত- ঢাকা

– ওসমান গনী সেলিম

ঘটনাটি ২০০১ সালের। ১৯৯৯–এ বিয়ের বাজারে হাতেখড়ি। প্রবাসের নয়টি বছরে মাতৃভূমিতে একটি ঈদ করারও সৌভাগ্য হলো না। পর পর আঠারোটি ঈদ অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম সামনের ঈদটি যে করেই হোক দেশে উদযাপন করবো।

সে সময়ে একটি ফাস্ট ফুড কম্পানিতে চাকরি করি। কম্পানির ব্যবসায়িক কারণে ঈদের মরসুমে ছুটি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই জেনেও তিন মাস আগেই ছুটির আশায় অগ্রিম আবেদন জানালাম। অনেক তদবির আর জোর লবিইং করেও কাজের কাজ কিছুই হলো না। উপায় না দেখে সিদ্ধান্ত নিলাম কম্পানি ছেড়ে দেবো।

পরদিনই স্থানীয় ইংরেজি দৈনিকে চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে একটি টুরিস্টিক কম্পানিতে ইন্টারভিউ দিতে ছুটে গেলাম। তিন দিন পর জানতে পারি বিভিন্ন দেশি ৭২জন প্রার্থী থেকে আমাদের বিশজনকে নির্বাচিত করা হয়েছে। জব অফার লেটারে সাইন করার তাগিদ পেয়ে ছুটে গেলাম।

জি.এম ছিলেন বৃটিশ মহিলা আর সেলস ম্যানেজার স্প্যানিশ। হালকা-পাতলা, লম্বা, লাল বর্ণের চল্লিশোর্ধ মহিলা।

ম্যাডাম আমাকে জব অফার লেটার দিলেন। সাইন করছি না। দেরি দেখে ম্যাডাম জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার?

ভেবেচিন্তে ছুটির ব্যাপারটা পুরোপুরি খুলে বললাম। সম্ভবত মহিলা বলেই আমাকে সারপ্রাইজ দিয়ে রাজি হয়ে গেলেন। হাসতে হাসতে লেটার সাইন করে দিলাম।

সেদিনই আগের কম্পানিতে পনেরো দিনের নোটিশ দিয়ে রিজাইন লেটার শো করি। বাধ সাধলো পার্সনেল ম্যানেজার। রিলিজ দেবে না। আকামা (Work Permit) কেটে দেবে। ইনডেমনিটি দেবে না। আরো কতো ভয়ভীতি।

আমিও নাছোড়বান্দা। আইনের ভয় দেখিয়ে এবং আমার একগুয়েমিতে অবশেষে দুই দিন গড়িয়ে রিলিজ অর্ডার হলো।

ঈদের আর মাত্র ৬৬দিন বাকি। নয় বছর পরে আমার ভুবনে এমন একটি ঈদের আগমন যা সপরিবারে আপন মাতৃভূমিতে উদযাপন করবো। গিন্নির সঙ্গে প্রথম ঈদ..., কতো যে কল্পনা। এখন কাজ হলো এ সংক্ষিপ্ত ব্যবধানে আকামা ট্রান্সফার করা।

এর ফাকে ছুটে গেলাম আগাম টিকেট বুকিংয়ের জন্য। আরেক বিপত্তি, আমাকে জানিয়ে দেয়া হলো বিমানের সবগুলো টিকেট আরো আগেই বিক্রি হয়ে গেছে। অবশেষে অন চান্সের টিকেট কাটলাম। কেনাকাটা করছি। আকামাও নতুন কম্পানিতে ট্রান্সফার হয়ে গেল।

অনেক অপেক্ষার পর ঈদের তিন দিন আগেই কাঙ্ক্ষিত ফ্লাইট ডেট এসে গেল। তিন ঘণ্টারও বেশি সময় হাতে নিয়ে এয়ারপোর্টে চলে গেলাম। সে কি ভয়াবহ অবস্থা। তিল পরিমাণ ঠাই নেই।

জাকির, নজরুল, মনজু, রাসেল, বকুল ও ছোট ভাই আনোয়ারসহ বন্ধু-বান্ধব ছিল প্রায় দশের বেশি। আমাকে সাময়িক বিদায় জানাতেই তাদের আগমন। যাহোক, ঈদের মরসুমে কুয়েত প্রবাসীদের দেশে যাওয়ার কি যে জোয়ার তা এয়ারপোর্টের দৃশ্য থেকেই ধরা যায়।

প্রচণ্ড ঠেলাঠেলি আর ভিড়ের মধ্যে মাথা ব্যথা ও বমি বমি ভাব শুরু হয়ে গেল। এর মধ্যে ভাবতে থাকি আজ বুঝি আমার এ চান্সের টিকেট দিয়ে দেশে যাওয়া হবে না। অন্যদিকে আমাদের সিরিয়াল ও লাইনের অনেকটা পেছনে। তাই বেগতিক দেখে বন্ধুদের পরামর্শে তারা অন্যান্যদের সঙ্গে জোরাজুরি করে, কখনো বা চোখে ফাকি দিয়ে, নিয়ম ভঙ্গ করে আমাদের লাগেজ অনেক সামনে নিয়ে গেল। মুষ্টিমেয় যাত্রীর নীরবতা থেকে ধরে নিলাম আমাদের গ্রুপ দেখেই সেদিন কেউ বারণ করেনি।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো। কাউন্টারে কর্মরত কর্মকর্তার সামনে এসে গেছি। পাসপোর্ট টিকেট বাড়িয়ে দিয়ে গভীর মনে বিধাতাকে স্মরণ করি। আল্লাহর কি হুকুম। বেচারা বোধ করি লক্ষ্য করেননি যে, আমার চান্সের টিকেট। ওজন চেক করে নব্বই দিনার দাবি করলেই দেরি না করে দিয়ে দিলাম। বোর্ডিং কার্ড পেয়ে তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করলাম। উপরের দিকে তাকিয়ে আবারও বিধাতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, আজ বন্ধুরা না থাকলে আমার দেশে যাওয়ার স্বপ্ন এয়ারপোর্টেই মিটে যেতো। আজকের দিনে এ যেন এক বিশেষ সারপ্রাইজ।

আর দেরি সহ্য হচ্ছে না। কখন গিয়ে গন্তব্যে পৌছাবো সে চিন্তায় মগ্ন।

ঢাকা এয়ারপোর্টে আরো সমস্যা দেখা দিল। বিভিন্ন দেশ থেকে পর পর অনেকগুলো প্লেন ল্যান্ড করায় যাত্রীদের ভিড়ে ট্রলির অভাব দেখা দিল। সে কি লম্বা লাইন। ঝামেলা এড়াতে এক ক্লিনারকে ডেকে এক দিনারের বিনিময়ে মুহূর্তেই দুটি ট্রলি মিলে গেল। মনে হচ্ছিল যেন ওইগুলো তার আগেই সংগ্রহ করা ছিল। আগেই জানা ছিল বাইরে ছোট মামা ও আব্বা অপেক্ষায় আছেন। ওখানে কোনো ঝামেলা হলো না। কোনো রকমে মাইক্রো ভাড়া করে সোজা বাড়ির উদ্দেশ্যে।

গিন্নি আগে থেকেই পিত্রালয় ছেড়ে শ্বশুরালয়ে চলে এসেছিল। পড়ন্ত বিকেলে বাড়ি পৌছে মাকে সালাম করে ছুটির ব্যাপারটা ভাবতে ভাবতে নিজেকে কালবিজয়ী পুরুষ বলেই মেনে নিলাম। এ গন্তব্যে পৌছাতে আমাকে যেসব বাধার সম্মুখীন হতে হলো সে জন্য আমার কোনো দুঃখ নেই। কারণ আমি জানি ঈদের আনন্দে সব একাকার হয়ে যাবে।

দুইদিন পরেই ঈদ। পরিবারের সকলের জন্য নিয়ে আসা জিনিশপত্র ইতিমধ্যে বণ্টন হয়ে গেল। অনেক অপেক্ষার ঈদের দিন এলো। পূর্ব আকাশে সূর্য উকি মারার আগেই চারদিকে কচি কচি ছেলেমেয়েদের মধ্যে আনন্দ ভাগাভাগির মহড়া শুরু হয়ে গেল।

ঈদের বিশেষত্ব ছাড়াও আজকের ঈদের দিনটি আমাদের পরিবারে বিভিন্ন কারণে স্মরণীয়। ছোট ভাইবোনরা আগে থেকেই যুক্তি করে রেখেছে আজ বড় ভাইয়াকে ধরা হবে। রুম থেকে বের হতেই একে একে সিরিয়াল লেগে গেল। কদমবুসি জানিয়ে সবাই হা করে তাকিয়ে কিছু পাওয়ার অদম্য নেশায় নীরবতা পালন করছে।

কৌতূহলী হয়ে বললাম, কি চাই তোমাদের? প্রত্যেকের দাবি মিটিয়ে বিদায় দিলাম।

হঠাৎ নজরে পড়লো আমার প্রিয়তমা বৌটিও ছোটদের পথ ধরে পৃপারেশনে ব্যস্ত। এক পর্যায়ে কদমবুসি সালাম করে মিষ্টি হেসে বলে দিল, ঈদ মোবারক, জীবনের প্রথমবারের মতো আদরিণী প্রিয়তমার সঙ্গে উদযাপন করছি একটি ঈদ। কি এক অপূর্ব সম্মান প্রদর্শন, আবেগে চোখের কোণায় নোনা পানি জমে গেল। তাকে সারপ্রাইজ দিয়ে দিনটাকে স্মরণীয় করে রাখলাম।

এক এক করে মা-বাবা, দাদিমা ও জেঠিদের কমদবুসি জানালাম। সকলেই মাথা বুলিয়ে আর্শীবাদ দিলেন। প্রাণটা ভরে গেল। আমার নয় বছরের জমে থাকা ঈদের পাওনাটুকু কয়েক মিনিটেই যেন পেয়ে গেলাম। ভাবতে থাকি হায়রে নিষ্ঠুর প্রবাস, কতো কিছু থেকেই না আমাকে বঞ্চিত করলি!

আজ ২০০২ সালের শেষ লগ্নে। কালের পরিক্রমায় আরেকটি ঈদ আমার দুয়ারে। পরিবারের সকলেই আমার অপেক্ষায় প্রহর গুণবে। গিন্নির ঈদ হয়তো পূর্ণতা পাবে না আমাকে ছাড়া। নবজাতক না দেখা শিশু কন্যাটিও সেদিন হয়তো আমার শূন্যতা বুঝে নেবে। ছোট্টরা এবার হয়তো

বড় চাওয়া–পাওয়ার প্ল্যানে আছে। মা–বাবা তো সবার আগেই। দাদিমা ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে গেছেন। শেষ লগনে দেখা হলো না। যতোই ঈদের দিন ঘনিয়ে আসছে ততোই যেন ওই শ্রেষ্ঠ ঈদটির স্মৃতিকণা হৃদয় কাননে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। আর আমি হারিয়ে যাই কল্পনার অথৈ সাগরে।
আসন্ন ঈদে কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকলেও বিশেষ প্রয়োজনেই আমার দেশে যাওয়া হচ্ছে না। কারণ নিয়ত করেছি এবারের ঈদটি পবিত্র কাবা শরিফে পালন করবো।

ছালমিয়া, কুয়েত থেকে

হতভাগিনী

আজ থেকে প্রায় চার বছর আগে। অনার্সের শেষ পর্যায়ে এসে খেয়াল করলাম এক জোড়া চশমা পরা চোখ যেন আমাকেই দেখছে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে। আবার চোখাচোখি হতেই ছোট একটু হাসি দিয়ে চোখ নামিয়ে নেয়। দিনের পর দিন সেই চোখ দুটির প্রতি আমিও আকৃষ্ট হতে থাকলাম।
বান্ধবীদের জানাতেই তারা এক বাক্যে সায় দিল এবং ব্যবস্থা করে দিল। ক্লাসমেট হওয়ার সুবাদে তার বন্ধুরা খুব সহজেই আমাদের দলে মিশে গেল। কিন্তু সে অর্থাৎ মারুফ ছিল বেশ চুপচাপ প্রকৃতির। আড্ডার মাঝে সে খুব একটা কথা বলতো না। তবে হাসতো খুব মিষ্টি করে। চশমা পরা ছেলেটি যখন হাসতো তখন ওর দুই গালে সামান্য গর্ত হয়ে যেতো যা ওকে ভীষণ মানাতো।
আস্তে আস্তে আমরা একে অপরের খুব ভালো বন্ধুতে পরিণত হই। কখনো সব বন্ধু–বান্ধবী মিলে, কখনো শুধু দুজনেই আশপাশে ঘুরতাম, বাইরে খেতাম, স্যারের কাছে পড়তাম। যেহেতু থার্ড ইয়ারের ক্লাস শেষ তাই সে সময় বেড়ানোটা বেশিই হয়েছিল। তবে আমরা কেউই পড়াশোনা ফাকি দিইনি একটুও। কারণ ক্লাসের প্রথম পাচজনের মধ্যে মারুফ ও আমি যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে ছিলাম।
এক সময় অনার্স পাস করে মাস্টার্স পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্টের অপেক্ষায় থাকলাম। এরই মাঝে সব বন্ধু–বান্ধব পিকনিক করলাম। কয়েকজনের বার্থডে ও বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিলাম। কারণ পরীক্ষার জন্য সব কিছু স্থগিত ছিল। অপেক্ষার পালা শেষে রেজাল্ট হলো। সবাই ভালোভাবে পাস করে বের হলাম। জানতাম আমরা একে অপরকে প্রচণ্ড ভালোবাসি। কিন্তু কেউ কাউকে তখনো মনের কথা বলতে পারিনি।
ছয় মাসের মাথায় একটা মাল্টিন্যাশনাল কম্পানিতে চাকরি পেয়ে যায় মারুফ। পোস্টিং ঢাকাতে। যাওয়ার দিন সে হঠাৎই বাসস্ট্যান্ডে একটা কাণ্ড করে ফেলে। অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে বাস ছাড়ার মুহূর্তে হঠাৎ নেমে এসে বললো, আমি তোমাকে ভালোবাসি।
আমি তো পুরো হতবাক হয়ে গেলাম ওর এ ধরনের অপ্রত্যাশিত আচরণে। যখন চেতনা ফিরলো তখন বাস অনেক দূর চলে গেছে।

তিন মাস পর চাকরি পেয়ে রাজশাহী চলে যাই। নতুন পরিবেশ, অচেনা জায়গা আপন করতে বেশ সময় চলে যায়। এর মাঝে ওকে নিয়ে প্রতিদিন নতুন স্বপ্ন গড়ি আর ভাঙি আবার গড়ি।

একদিন হঠাৎ মারুফ রাজশাহী চলে আসে। যদিও ফোনে আমাদের প্রায়ই কথা হয় তবুও ওর আসার কারণ বুঝলাম না।

পরদিন একটা নামকরা রেস্টুরেন্টে ঢুকে মারুফকে দেখে ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম। একি চেহারা হয়েছে। কিছু একটা যে হয়েছে তা ওর ভাঙাচোরা চেহারা দেখেই বুঝলাম। কারণ জিজ্ঞাসা করতেই বললো, চলো, আমরা আজ এক্ষুণি বিয়ে করবো।

ওর কথায় আমি আকাশ থেকে পড়লাম। আস্তে আস্তে জানলাম, আমার সঙ্গে বিয়েতে ওর ফ্যামিলির আপত্তি আছে। কেন আপত্তি তা বার বার জানতে চেয়েও উত্তর পেলাম না।

কিন্তু আমি জানি সেই কেন–র উত্তর। ছোটবেলায় পোলিও হওয়াতে আমার এক পা অন্য পায়ের তুলনায় বেশ ছোট ও চিকন। হাটার সময় স্পষ্টতই বোঝা যায়। আর এ কারণেই বুঝি...।

নিজেকে সামলে নিয়ে ওর হাতের ওপর হাত রেখে বললাম, ফ্যামিলির অমতে বিয়ে করে আমরা কেউই সুখী হতে পারবো না। তুমি ফিরে যাও, নাইবা পারলাম ভালোবাসার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে। কিন্তু বন্ধু হিসেবে আমরা যতোটা কাছে এসেছি, যতোটা সময় একত্রে কাটিয়েছি এই বা কম কিসের মারুফ। প্লিজ, তুমি তাদের বিরুদ্ধে যেও না, পাগলামো করো না। ফিরে যাও।

অনেকক্ষণ কান্না চেপে রাখলাম। কিন্তু রিকশায় বসে আর পারলাম না।যে সমাজে ছেলের নিজস্ব পছন্দ করা বৌকে যোগ্যতার পরিচয় দিতে হয় প্রতিনিয়ত, যে সমাজে নতুন বৌকে শ্বশুরবাড়িতে ঢোকার আগে নিজস্ব ইচ্ছাকে ছুড়ে ফেলতে হয়, যেখানে বৌয়ের দৃশ্যত কোনো খুত না থাকা সত্ত্বেও হাজারটা যুক্তিহীন খুত টেনে বের করা হয় সেখানে আমার তো দৃশ্যমান খুত!

ভেতরের কষ্টগুলো অশ্রু হয়ে ঝরে পড়তে থাকলো অঝোর ধারায় অবিরত।

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

বাস্তবতা

– মুকুল

খাটের ওপর বসে যায়যায়দিনের জন্য টাইটেল লিখছে বেবী। খাট বললে ভুল হবে, এটা চৌকি, তাও নিজেরা কিনিনি। আমাদের আগে যে ভাড়া থাকতো সে ফেলে গেছে। আর যে টেবিলটিতে বসে লিখছি সেটা মালিক দিয়েছে। একটি আলনা আছে যেটা আমার সম্পত্তি, হল থেকে নিয়ে এসেছি। এই হলো আমাদের সংসার।

ডিসেম্বরের ২৭ তারিখে আমাদের বিয়ের প্রথম বার্ষিকী। অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন নতুন বিয়ে এবং প্রেমের বিয়ে। যদিও পারিবারিকভাবেই সব হয়েছে। তবে কোনো পক্ষই খুব আগ্রহের সঙ্গে এর আয়োজন করেনি। ছেলের পক্ষ মানে আমার পক্ষ থেকে আমার মা রাজি হয়েছেন আমার মুখের দিকে চেয়ে। এবং মেয়ের পক্ষ রাজি হয়েছিল আমার জেদের কারণে। তারা বুঝতে পেরেছিল রাজি

না হলেও আমি বিয়ে করে ফেলবো। কারণ মেয়ে আমার পক্ষে। যা করার আমিই করেছি। কেউ আমাকে সাহায্য করেনি। নিকট আত্মীয়রা দায় সেরেছে হয়তো কিছুটা দয়ার কারণে। গোপনে বেহায়া বলেছে। বলেছে, বাপের অনুপস্থিতিতে যা ইচ্ছে তাই করছে। কেউ আমার প্রকৃত অবস্থাটা বুঝতে চায়নি।

আসলে এটাই বাস্তবতা।

আমি কি পেয়েছি জানেন? আমি ভালোবাসা পেয়েছি, একদম স্বচ্ছ ভালোবাসা। আমার ভালোবাসাকে বাচিয়ে রেখেছি। অনেক কষ্ট হয়েছে। তবুও এমন একটা পরিবারে আমার জন্ম যেখান থেকে পেয়েছি পড়াশোনার তাগিদ। এর জন্য এখন পর্যন্ত টিকে আছি। পেয়েছি রাজনীতির রক্ত যা ইউনিভার্সিটির প্রথম দিকের ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে। এবং পেয়েছি অতিরিক্ত না হলেও খুব ভালোভাবে চলার মতো অর্থ যা আমাকে আমার ভালোবাসাকে বাচিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে।

ফার্স্ট ইয়ারে আমার কাজ ছিল প্রয়োজন মতো পড়াশোনা, রাজনীতি এবং বন্ধু–বান্ধবীদের সঙ্গে আড্ডা। শেষেরটার পরিমাণই বেশি ছিল। এ আড্ডার ছলেই তার সঙ্গে পরিচয়। ক্লাস, মিছিল, কোনোটাই না থাকলে ফ্যাকাল্টির সামনে বসে আড্ডা মারা ছিল নিয়মিত কাজ।

একদিন বসে বসে রাস্তা দিয়ে যেসব মেয়েগুলো যাচ্ছে তাদের নিয়ে কোনো না কোনো মন্তব্য করছি। আমার সঙ্গে একজন বান্ধবী। অন্য বন্ধুরা যার যার মতো গল্প করছে। একজন আসছে, খুব আহামারি সুন্দরী নয়। কিন্তু খুব মায়াবী চেহারা। বান্ধবীকে বললাম, এ রকম একটি মেয়ে হলে বিয়ে করা যায়। শুধু এটুকুই।

তার দুই তিন দিন পর বান্ধবী বলছে, তোমার সঙ্গে আমার রুমমেট দেখা করবে। জিজ্ঞাসা করলাম, সে কে?

তার উত্তর, তুমি যাকে দেখে বলেছিলে বিয়ে করা যায়।

তখন প্রথম আমি জানি, সেই মেয়েটি ছিল বান্ধবীর রুমমেট। সে আমার কথা তার কাছে বলেছে একটু বাড়িয়েই বলেছে এবং মেয়েটি আমার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

এভাবেই তার সঙ্গে আমার পরিচয় এবং এর ছয় বছর পর বিয়ে। প্রথম পরিচয়ের পর থেকেই আমার মনে হয়েছে সে আমার এবং সেও নিরাশ করেনি কোনোদিন। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত ভুল বোঝাবুঝি যা হয়েছে তৃতীয় কোনো পক্ষ জানেনি কখনো। সে কখনো ঠকায়নি আমাকে। আমিও সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি নিজেকে ফেয়ার রাখতে।

ঘটনাগুলো সংক্ষেপে এটুকুই। কিন্তু আরেকটু বিস্তারিত বলার দরকার মনে করছি।

তার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগে দিনগুলো ভালোই কাটছিল। কোনো ঝামেলা ছিল না। কোনো পিছুটান ছিল না। বাবা টাকা দিতেন, আমি খরচ করতাম। জীবনে অনেক মেয়ে এসেছে, চলে গেছে, জড়াইনি কখনো। তাই ক্যাম্পাসে এসেই অনেক বান্ধবী জুটে যায়। কিন্তু নিজের করে ভাবতে চাইনি কাউকে। পাছে আমার স্বাধীনতা নষ্ট হয় এই ভয়ে। তবে এই মেয়েটার সঙ্গে পরিচয় হয়ে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। সে চুম্বকের মতো টানতে লাগলো। তারপরও কিছুদিন আমার মতো থাকতে চাইলাম। পারলাম না। সে আমাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতো। সে আমাকে ভালোবাসা শেখালো। এরপর আমার সঙ্গে তার জীবন গেথে দিল।

আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না যে, মেয়েটিকে নিয়ে আমি কি করবো। আমি তো তাকে কষ্ট দিতে পারবো না। তার ভালোবাসা কি বাচিয়ে রাখতে পারবো? এই সব চিন্তার সমাধান এসে গেল যখন আমার আব্বা মারা গেলেন। ততোদিনে বছর পার হয়েছে পরিচয়ের। আব্বা মারা যাবার পর পরিবারের বড় ছেলে হিসেবে সব দায়িত্ব আমার। আমি পারলাম না নিজেকে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিতে। তার ওপর আমি নির্ভরশীল হয়ে গেলাম। রাজনীতি থেকে দূরে আসতে লাগলাম তার অনুপ্রেরণায়। সে আমাকে দুই হাত দিয়ে আগলে রাখলো। এবং তখন থেকেই আমার ভালোবাসা বাচিয়ে রাখার সংগ্রাম শুরু হলো। এখানে বলে রাখি, আমরা কেউ কাউকে অফার করিনি কখনো এবং ফরমালি কোনো কথাও হয়নি কখনো।

যাহোক, বিপদ যখন আসে তখন সব দিক দিয়েই আসে। তার বাড়িতে সব জেনে গেল। শুরু হলো তার ওপর নির্যাতন। শারীরিক, মানসিক উভয় দিক দিয়ে এবং সেটা প্রতিনিয়ত। তখনই সিদ্ধান্ত নিলাম বিয়ে করতে হবে। এখন কিছুদিন ঠেকানো গেলেও পড়াশোনা শেষে আর সম্ভব নয়। আমার মাকে জানালাম সব কিছু। মা মাটির মানুষ, কিছু সমস্যা দেখালেন। কিন্তু অরাজি হলো না। এবং আমি প্রস্তুত হওয়া শুরু করলাম কিভাবে সংসার চালাবো বিয়ে করলে। আমার পণ ছিল যদি বেকার বয়সে বিয়ে করি তাহলে আমার রোজগার দিয়েই বৌকে খাওয়াবো। মা বা অন্য কারো সাহায্য কখনোই নেবো না। সেই ভাবে শুরু হলো নিজের অর্থ জমানো। সেও আমাকে সাহায্য করলো। এভাবে একটা বড় অংক সংগ্রহ করে ফেললাম দুই বছরের মধ্যে।

টাকা জমানো যখন শুরু করলাম তখন আরেক বিপদ দেখা দিল। তার টাইফয়েড হলো। এটা এমন ভোগানো শুরু করলো যে, জীবন–মরণ সমস্যার সৃষ্টি হলো। যার ফল আজও আছে। অসুখে তার রূপ ও যৌবনের অনেকখানি ধস নামিয়ে দিল এবং এই অসুখ নিয়ে তার পরিবারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আরো খারাপ হলো। বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিলাম তার মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এবং করলামও তাই। আমার পরিকল্পনার সর্বশেষ যে যুক্তি ছিল তা হলো, আমার কোর্স যেহেতু তার চেয়ে এক বছরের বেশি, তাই আমাকে এক বছর বেশি থাকতে হবে। এই এক বছরও যদি বাড়ি থাকে তাহলে এই মেয়েকে হয়তো বাচানো যাবে না। এমনিতেই খুব স্পর্শকাতর, তারপর যদি পারিবারিক নির্যাতন এবং আমার প্রতিষ্ঠার আশায় বসে থাকতে হয় তাহলে সেটা খুব অমানবিক হবে। আমি চাচ্ছিলাম না সে কোনো কষ্ট পাক। কারণ সে আমাকে যা দিয়েছে তার বিনিময়ে তাকে কষ্ট দেয়ার কোনো অধিকার আমার নেই। হ্যা, আপনাদের দোয়ায় আমরা ভালো আছি, খুব ভালো। আমার এই লেখার কিছু উদ্দেশ্য আছে তা হলো –

● আমাদের মধ্য দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যা আমাদের ভালোবাসাকে টিকিয়ে রেখেছে। এর মূল কারণ হলো, আমরা কখনো কোনো কথা কাউকে লুকাতাম না এবং অতীত জীবনেরও না। কখনো মিথ্যা বলতাম না।

● ভালোবাসার সঙ্গে কখনো অবিচার করা উচিত নয়। ভালোবাসা কিছুটা হলেও পবিত্র হওয়া দরকার। দুজনের সম্মতিতে সবই হওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রতারণা করে কোনো অপরাধ করা ঠিক নয়। এতে ভালোবাসার দৃঢ়তা কমে যায়।

● আমার বিশ্বস্ত ভালোবাসা প্রকৃতি প্রদত্ত, এটা জোর করে করা যায় না। তাই এই ব্যাপারে কারো জোর করা ঠিক না। এবং যতো বড় লোভেই ভালোবাসার সঙ্গে প্রতারণা করুন না কেন, এর প্রভাব জীবনে পড়বেই।

● আমাদের দেশ গরিব দেশ। আমাদের প্রধান সমস্যা হলো অর্থনৈতিক। তাই ভালোবাসার প্রথম দিন থেকে দুজনই সঞ্চয় করুন। কারণ অর্থ থাকলে মনে জোর পাওয়া যায়। ভালোবাসা বাচিয়ে রাখতে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। পরিবার এক সময় সব কিছুই মেনে নেয়। তবে শুধু অর্থের বা সামর্থের অভাবেই অনেক ভালোবাসা নষ্ট হয়।

আমার শেষ কথা হলো, যেভাবেই পারেন, যতো কষ্টই হোক ভালোবাসাকে বাচিয়ে রাখুন। আমার দিকে তাকান, অনেক কষ্ট করেছি, শারীরিক, মানসিক, আর্থিক সব। গত বছর যায়যায়দিনের ভালোবাসা অনুষ্ঠানে যেতে পারিনি। বন্ধুরা জানে ব্যক্তিগত কারণে যাইনি। কিন্তু আমি জানি শুধু টাকার জন্য যাইনি। আমার চিঠি নিয়ে অন্যজন গেছে। তবুও ভালো আছি। একটু কষ্ট হচ্ছে তাতে কি? এ তো সাময়িক। এই তো মাত্র ছয় মাস আছে আমার পড়াশোনা। তারপর মুক্তি। আমি শুধু পেরেছি আমার দৃঢ় আস্থা তার উপর এবং আমার দৃঢ় ইচ্ছা ভালোবাসাকে বাচিয়ে রাখবো। সর্বশেষ, আমার টাকা ছিল। তাকে নিয়ে এই এক বছর চলছে তার জন্য আমার কারো কাছ থেকে সাহায্যের দরকার হয়নি। আবারও বলি, যেভাবেই হোক ভালোবাসাকে বাচিয়ে রাখুন।

রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে

মোনালিসা

– ডা. এম. আর রহমান

আমি তখন খুব ছোট। সবে স্কুলে যাওয়া শুরু করেছি। আমি যে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম সেই স্কুলেই আমার সঙ্গে দুই তিন বাড়ি দূরের একটি মেয়ে ভর্তি হয়েছিল। আমাদের দুজনের মধ্যে অল্প দিনের মধ্যেই বন্ধুত্ব হয়েছিল। আমরা এক সঙ্গে স্কুলে যেতাম, এক সঙ্গে খেলতাম, প্রায় সব সময়ই এক সঙ্গে থাকতাম। এভাবে প্রাইমারি, হাই স্কুল এক সঙ্গে একই স্কুল থেকে পাস করার পর আমি ও সে একই কলেজে ভর্তি হলাম। তখনো আমরা এক সঙ্গেই সব কিছু করতাম। আমাদের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু কখন যে তাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম একটুও বুঝতে পারিনি। এক সঙ্গে মেলামেশা করার কারণে আমরা সব ধরনের আলাপ-আলোচনা করতাম।

একদিন সে আমাকে বললো যে, একটি উপহার দেবে। কিন্তু যে উপহারটি দেবে তার জন্য আমাকে একটি পরীক্ষা দিতে হবে।

আমি শুধু ও ও করে যাচ্ছি। আসলে তার নামটি ছিল মোনালিসা।

পরীক্ষাটা আসলে এ রকম যে, আমাকে বলতে হবে আমি তোমাকে ভালোবাসি। কিন্তু এটা বলতে হবে মোনালিসার মনের মতো করে। যদি আমি কথাটি মোনার (মোনালিসার) মনের মতো করে বলতে পারি তবেই সে আমাকে উপহারটি দেবে।

সঙ্গে সঙ্গেই তার কথায় রাজি হয়ে যাই। আসলে মনে মনে তো মোনাকে ভালোবেসেই ফেলেছি। কিন্তু তখনো বুঝতে পারিনি মোনাও আমাকে ভালোবাসে। আমি বলা শুরু করলাম। মোনালিসা শুধু শুনেই যাচ্ছে। আমি বলেই চলেছি, সে শুধু শুনেই যাচ্ছে। এভাবে কতোবার যে কথাটি বলেছি তার হিসাব নেই। শেষে আমিই থেমে গিয়ে বললাম, আর কতোবার বলতে হবে?

মোনালিসা একটু হেসে বললো, সারা জীবন। তারপর আবার বললো, ঠিক আছে শুধু আর একবার বলো।

আমি আবার বললাম, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

এবার সঙ্গে সঙ্গেই মোনা আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, আগামীকাল আমি তোমাকে আমার উপহারটি দেবো। তুমি ঠিক সকাল দশটায় আমাদের বাড়িতে চলে এসো।

মোনালিসার কথা মতো ঠিক সকাল দশটায় তাদের বাসায় গেলাম। গিয়ে দেখি তাদের বাসায় কেউ নেই। শুধু মোনালিসা।

দরজায় শব্দ করার সঙ্গে সঙ্গেই সে দরজা খুলে দিল। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই আমি যেন জ্ঞান হারালাম। কারণ মোনাকে সেদিন অস্বাভাবিক সুন্দর লাগছিল। এমনিতেই সে খুব সুন্দর। কিন্তু সেদিন অন্য রকম সুন্দর লাগছিল।

মোনালিসা একটা নীল রঙয়ের শাড়ি পরেছিল সেদিন। আমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই জড়িয়ে ধরে ভেতরে নিয়ে গেল। সরাসরি মোনার ঘরে আমাকে নিয়ে বসালো তার নিজের বিছানায়। তারপর আমরা অনেকক্ষণ গল্প করলাম। সে আমার পছন্দের অনেক খাবার খাওয়ালো।

এরপর আমার উপহারটি চাইলে সে শুধু মিষ্টি একটি হাসি দিয়ে বললো, আমিও তোমাকে ভালোবাসি, খুব ভালোবাসি, খুব বেশি ভালোবাসি। বলেই আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার ঠোটে একটা কিস করলো।

আমি যেন বাকশক্তি হারিয়ে ফেললাম। মোনালিসা তার ঠোটটি আমার ঠোটের ওপর চেপে ধরে রইলো।

আমরা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কতোক্ষণ ছিলাম নিজেও তা জানি না। এক সময় মোনা আমাকে ছেড়ে দিতেই তার শাড়ির আচলটি মাটিতে পরে গেল। তার দিকে তাকিয়ে আছি।

সে আমাকে বললো, তোমাকে যে উপহার দিতে চেয়েছিলাম তা এখন তোমার সামনে। একে তুমি তোমার মতো করে গ্রহণ করো।

আমি আবার তাকে জড়িয়ে ধরলাম। এরপর এক এক করে সে সব ব্লাউজ, ব্রা খুলে ফেললাম। এই প্রথম কোনো নারীর নিরাবরণ স্তন সামনাসামনি দেখলাম। এরপর...।

এরপর এখনো আমরা এক সঙ্গেই আছি।

যে কোনো একটি কারণে তাকে ভর্তি হতে হয়েছিল বিএ-তে আর আমি ভর্তি হয়েছিলাম রাজশাহী মেডিকালে। কিন্তু আমাদের ভালোবাসা এখনো আছে। আমি এখন একজন ডাক্তার। এ লেখা যখন প্রকাশ পাবে ততোদিনে আমার ও মোনালিসার শুভ বিয়ে হয়ে যাবে।

আর একটি কথা না লিখলেই নয়। আসলে তার নাম মোনালিসা নয়। আমি এখানে তার একটি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছি। এবং তার অনুরোধেই আমার এ লেখা।

হাজীপাড়া, ঠাকুরগাও থেকে